সমন্বয়

নয়ডা বেঙ্গলী কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের ত্রৈমাসিক বাংলা মুখপত্র

৩৪তম সংখ্যা

শ্রাবণ ১৪২২ (জুলাই ২০১৫)

সম্পাদকীয়

"এসো নীপবনে ছায়াবীথি তলে, এসো করো স্নান নবধারা জলে..." গ্রীষ্মের দাহদাহের মধ্যে এমন আহ্বান কার না ভাল লাগে। নবধারাজলে স্নান করে শীতল হওয়ার এই আহ্বান এখন প্রকৃতিতে। সুপ্তমনের নতুন করে জেগে ওঠার সময় এখন... কারণ আষাঢ় এসেছে... এসেছে বর্ষাকাল। বর্ষার ভারী বর্ষণে শরীর ধুয়ে নেয় প্রকৃতি... পরিচ্ছন্ন হয়... নতুন করে জেগে ওঠে মানুষের প্রেরণা, বেল-বকুল-জুঁই-দোলনচাঁপা-গন্ধরাজ-হাসনাহানার গন্ধে ভরে ওঠে চারিদিক। আর 'বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল' এর হাসিতো ভুবন ভোলানো। বাংলার শহরে, গ্রামে সর্বত্র বর্ষার আগমনবার্তা দেয় কদমফুল। পেখম মেলে ধরে ময়ূর-বৃষ্টির জল গায় নিয়ে তারা নৃত্য করে। সেই মেঘঘন বর্ষার আষাঢ় আজ সমাগত হয়েছে আমাদের চারিপাশে।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'জ্যৈষ্ঠের পিঙ্গল জটা শ্রাবণের মেঘস্তূপে নীল হইয়া উঠে... গ্রীষ্মকে ব্রাহ্মণ বলা যাইতে পারে। সমস্ত রসবাহুল্য দমন করিয়া... তপস্যার আগুন জ্বালিয়া সে নিবৃত্তিমার্গের মন্ত্র সাধন করে। সাবিত্রী মন্ত্র জপ করিতে করিতে কখনো বা সে নিঃশ্বাস ধারণ করিয়া রাখে। তখন গুমোট গাছের পাতা নড়ে না। আবার যখন সে রুদ্ধ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া দেয় তখন পৃথিবী কাঁপিয়া ওঠে। বর্ষাকে ক্ষত্রিয় বলিলে দোষ হয় না। তাহার নকিব আগে গুরু গুরু শব্দে দামামা বাজাইতে বাজাইতে আসে - মেঘের পাগড়ি পরিয়া পশ্চাতে সে নিজে আসিয়া দেখা দেয়। লড়াই করিয়া সমস্ত আকাশটা দখল করিয়া সে দিক্‌চক্রবর্তী হইয়া বসে। তমালতালি বনরাজির নীলতম প্রান্ত হইতে তাহার রথের ঘর্ঘর ধ্বনি শোনা যায়। তাহার বাঁকা তলোয়ারখানা ক্ষণে ক্ষণে কোষ হইতে বাহির হইয়া দিগবক্ষ বিদীর্ণ করিতে থাকে।

এই বর্ষা ঋতু যেন শুধু বাঙালির ঋতু - কবিদের ঋতু - রবীন্দ্রনাথ, নজরুলের ঋতু। তাইতো এই বর্ষারবন্দনায় কবি নজরুল লিখেছেন "রিমঝিম রিমঝিম ঘন দেয়া বরষে'// 'কাজরী নাচিয়া চল পুরনারী হরষে' কবিগুরুর ভাবনায় এসেছে, "মন মোর মেঘের সঙ্গী, উড়ে চলে দিগ্ দিগন্তের পানে, নিঃসীম শূন্যে, শ্রাবণবর্ষণ সঙ্গীতে, ...রিমিঝিম্ রিমিঝিম্ ... রিমিঝিম্।"

বৃষ্টি ঝরুক আর নাই বা ঝরুক, 'বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল' ফুটুক আর নাই বা ফুটুক , ময়ূর পেখম মেলুক আর নাই বা মেলুক, বর্ষার দিন মানে শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে কবিতার খাতা, ডায়রির পাতা ভরে তোলার দিন। মেঘের ভেলায় ভেসে, কদম ফুলের ডালি সাজিয়ে নবযৌবনা বর্ষার সতেজ আগমন হয়েছে। হঠাৎ করে ঝরে পড়ে প্রবল বৃষ্টি - স্নাত করে দেয় শুকনো মাটির বুক - সিক্ত করে দেয় তৃষ্ণার্ত গাছপালা। বৃষ্টির শীতল স্পর্শে জুড়িয়ে দেয় তপ্ত হৃদয়। বর্ষার দিনগুলি হয় কাব্যময় - প্রেমময়। মন হয় উতলা কবিগুরুর সুরে গেয়ে ওঠে, "পাগলা হাওয়ার বাদল দিনে, পাগল আমার মন জেগে ওঠে...' এই বর্ষাকেই বাংলার কিংবদন্তী শিল্পীরা বন্দনা করেছেন বিভিন্ন ভাবে, তাদের গানের সুরে। লতাজীর গাওয়া "আষাঢ় শ্রাবণ, মানে না তো মন" হেমন্তজীর 'এই মেঘলা দিনে একলা', মান্না দের 'শাওন রাতে যদি', ভূপেন হাজারিকার 'মেঘ থম থম করে, কিংবা ফিরোজা বেগমের, 'এমনি বরষা ছিল সেদিন', বা রুণা লায়লার 'এই বৃষ্টি ভেজা রাতে'। বাংলার গানের ভান্ডারকে আবেগময় করে তুলেছে।

বর্ষাকাল আসা মানেই আমরা জানি বাঙালির খাবার পাতে ইলিশ মাছ, বৃষ্টিতে ভিজে বাজারের থলি ভরে যখন ঘরে ইলিশ মাছটা আসে, তখন স্বভাবতই বাঙালির জিহ্বা জলে ভরে ওঠে, বৃষ্টি ঝরা সকালে যখন ক্ষণে ক্ষণে আকাশ আঁধার হয়ে আসে, আমাদের ভোজন রসনাও বেড়ে যায়। আর তাই বর্ষায় বৃষ্টির এক অবিচ্ছেদ্য অনুসঙ্গ হয়ে ওঠে খিচুড়ি ইলিশ-গরম গরম ইলিশ মাছ ভাজা।

বর্ষাকালের ছবি আমরা এইভাবেই দেখে অভ্যস্ত হয়েছি, আজকের প্রজন্ম আকাশছোঁয়া বাড়ির অলিন্দে দাঁড়িয়ে হয়তো বৃষ্টির কিছু ফোঁটা শরীরে নিতে পারে, কর্দমাক্ত রাস্তায় গর্ত্তে ভরে ওঠা খানাডোবায় যখন গাড়ির চাকা বসে গিয়ে কোমরে ধাক্কা খায়, কিংবা চলন্ত গাড়ির ছিটিয়ে যাওয়া কাদাজল পথচলা যাত্রীর বসন মলিন করে, তখন শুধু নির্দয়ভাবে বর্ষাকেই অপরাধী করি। আজকের যান্ত্রিক যুগে যখন বৃষ্টির জলে ভরা রাস্তায় গাড়ি থমকে চলে, তখন এই বর্ষাকালকেই দায়ী করা হয়

জীবনযাত্রার গতি থামিয়ে দেওয়ার জন্য। তবুও আজকের প্রজন্ম যখন 'Rainy Day' বানায় স্কুলে বা কলেজে না গিয়ে, অফিস যাত্রীরা আটকে পড়ে বাড়ির অন্দরে, তখন কিন্তু দুপুরের ভোজন রসনা মন মাতিয়ে রাখে।

প্রচণ্ড গরমের মধ্য থেকে এই বর্ষাই শুকিয়ে যাওয়া জীবনটাকে সতেজ করে দেয়। আসুন, আমরা সকলে আজ এই বর্ষার বন্দনায় বলি, "হোক না রাস্তা কাদামাখা, হোক না traffic jam চলার পথে তবুও ভাল লাগে গরম ইলিশ ভাজা।

সবার শেষে আমাদের একটি জরুরী বক্তব্য জানাতে চাই আমাদের সকল পাঠকদের কাছে। আমরা এই 'সমন্বয়ের' মাধ্যমে বাংলা ভাষা বিকাশের প্রয়াস করে চলেছি। বাংলা লেখায় যে কত মজা লুকিয়ে আছে তারই স্বাদ দিতে চাইছি প্রবাসী বঙ্গভাষীদের। এর জন্য চাই আপনাদের সকলের অকৃপণ সহায়তা, আমরা চাই বাংলা লেখা - সে গল্পই হোক, কবিতাই হোক, ভ্রমণকাহিনীই হোক বা রম্য রচনা হোক। এই ত্রৈমাসিক সমন্বয় পত্রিকাটি আপনাদের সকলের মনের ভাব তুলে ধরতে পারে - পারে আপনাদের অবসর সময়ে একুট বিনোদনের ব্যবস্থা করতে। কিন্তু যদি আপনাদের কাছ থেকে লেখা না পাওয়া যায়, তাহলে হয়তো আমাদের এই প্রয়াস মুখ থুবড়ে পড়তে পারে। আমরা সনির্বন্ধ অনুরোধ করি সেদিন যেন না দেখতে হয়, আসুন আপনারা এগিয়ে পাঠিয়ে দিন আপনাদের লেখা আমাদের দপ্তরে।

নমস্কার।

সংঘবার্তা

এ বৎসর ১লা বৈশাখ সমিতির সকল সদস্য সন্ধ্যায় এক বিশেষ মিলন সভায় মিলিত হন প্রায় ৫০০ সভ্য সমিতির প্রাঙ্গনে একে অন্যের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। নববর্ষে এই জাতীয় শুভেচ্ছা বিনিময় সত্যই অভূতপূর্ব। সন্ধ্যায় মায়ের মন্দিরে বিশেষ পূজার আয়োজন হয়। পূজার পর উপস্থিত সভ্যবৃন্দ প্রসাদ ও মিষ্টি গ্রহণ করেন।

এ বৎসর ১৭ মে রবিবার সকালে সমিতির প্রাঙ্গনে কবিপ্রণাম অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। প্রথাগত হিসাবে মুক্ত পরিবেশে, প্রকৃতির সাহচর্য্যে প্রতিবৎসরের মত গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের জন্মজয়ন্তী পালিত হয়। প্রায় ৬০ জন শিল্পী এই অনুষ্ঠানে গান ও আবৃত্তি পরিবেশ করে অনুষ্ঠানকে সাফল্য প্রদান করেন। অনুষ্ঠান বিনা ঘোষণায়, তালিকা অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হয়। গত ২৮শে জুন সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি মহাশয় শহরে উপস্থিত না থাকায়, সহ সভাপতি শ্রী রজত ব্যানার্জী সভায় সভাপতিত্ব করেন। গত বছরের আয় ব্যয়ের হিসাব ও কার্য্যবিবরণ এই সভায় আলোচনা এবং গৃহীত হয়। আসন্ন দূর্গাপূজা নিয়েও প্রাথমিক কথাবার্তা হয়। সংঘের আয় বৃদ্ধি করার বিষয়েও আলোচনা হয়।

আসন শুদ্ধি

সনাতন মুখার্জী

পূজার প্রথমেই পঞ্চশুদ্ধির প্রয়োজন হয়। আসন শুদ্ধি, জল শুদ্ধি, পুষ্প শুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি, প্রতিমা শুদ্ধি, শুদ্ধিকরণ ছাড়া কোন কিছুই ব্যবহারের উপযোগী হয় না। সেই জন্য পূজার প্রথমেই চাই আসন শুদ্ধি, কিভাবে আসন শুদ্ধি করা হয়। "স্থিরসুখমাসনম্"। (যোগ দর্শন ২/৪৬) যে কোন আসনে স্থিরতা পূর্বক দীর্ঘ সময় বসাকে আসন বলা হয়।

পৌরাণিক মন্ত্র = অস্য আসনোপবেশন মন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠঋষিঃ সুতপং ছন্দঃ কুর্ম্মোদেবতা আসনোপবশনে বিনিয়োগঃ। বিনয়োগ ঃ শব্দের অর্থ সূত্র। এই সূত্রে বলা হয়েছে তিনটি বিষয় ১) মেরুপৃষ্ঠঋষি ঃ আসনে বসার সময় পৃষ্ঠদেশ কিরূপ থাকবে - মেরুপৃষ্ঠ ঋষিঃ মেরু অর্থাৎ পর্বত। পর্বত যেমন সোজা ও স্থির থাকে, আসনে বসার সময় মেরুদণ্ড সোজা ও স্থির হওয়া উচিৎ। বেশি নড়াচড়া চলবে না, নড়লে মেরুদণ্ডের মধ্যে যে সুষুম্নানাড়ীর গতিপথ আছে তার কাজের ব্যাঘাত হবে। স্থিরতা আসবে না।

২) সুতপং ছন্দঃ আসনে বসার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে দুই পা ও জানু প্রদেশ যেন সুতল - অর্থাৎ সমতলে থাকে। অনেক প্রকার ধ্যানাসন আছে,তার মধ্যে পদ্মাসন হল উৎকৃষ্ট আসন। এতে সুতপ ভাব সম্ভব। আসন সুতপ হলে পরবর্তী ক্রিয়াগুলি সহজ সাধ্য হয়।

৩) কুর্ম্মোদেবতা - কুর্ম্ম অর্থাৎ কচ্ছপ। কচ্ছপ যখন চলতে থাকে তার চারটি পা ও মুখদেশ বাইরে থাকে। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পাঁচটি অঙ্গই ভিতরে গুটিয়ে ন্যায়। আসনদেরও পাঁচটি ইন্দ্রিয় চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জীহ্বা, ত্বক বর্হিমুখী হয়ে থাকে। আসনে বসে এই বর্হিমুখী ইন্দ্রিয়কে অন্তরমুখী করে নিতে হয়। অর্থাৎ মনকে একাগ্র করে নিতে হয়।

এই আসন কোথায় ও কিভাবে পাতা হবে:- শুচৌদেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ

নাতুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরম (গীতা ৬/১১)

পবিত্র স্থানে আসন স্থাপন করতে হবে। আসন যেন অতি উচ্চ অথবা অতি নিম্ন না হয়। কুশের আসনের উপর ব্যাঘ্রাদি চর্ম এবং তার উপর বস্ত্র পাতিয়া আসন করিতে হয়। এর কারণ হল মাটির ঠান্ডা যেন না লাগে। কীটাদি যেন সহজে উঠে না পড়ে, শরীরে যে বৈদ্যুতিক তেজ ও শক্তি সঞ্চার হয় তা যেন পৃথিবী টেনে নিতে না পারে।

বাহ্য অভ্যন্তর শুচি। এতক্ষণ বাহিরের পবিত্র স্থানের কথা বলা হল, শরীরের অভ্যন্তরে এইরূপ পবিত্র স্থান কোথায়। সুষুম্নার অভ্যন্তরই হল শুদ্ধস্থান। এখানে যে ব্রহ্মনাড়ীআছে তা 'মহাপাপবিমোচনী মহাপুণ্যময়ী নিত্য' তাই শুচি বা পবিত্র স্থান। বাহিরের আসনে যথারীতি উপবেশন করে সুষুম্নার ঐ শুচিস্থানে না অতি উঁচু, না অতি নীচু মাঝামাঝি স্থানে, অর্থাৎ সুষুম্না নাড়ীর ভিতর যে সপ্ত চক্র আছে, সপ্তচক্রের মধ্যকার হৃদয়ে অনাহত চক্রে আতম আসন প্রতিষ্ঠা করতে হয়। হৃদেশে তব তিষ্ঠতি অর্জুন।

কুশ - ব্রাহ্মীশক্তি - পৃথ্বিতত্ত্ব এর স্থান মূলাধার চক্র।
অজিন - বৈষ্ণবী শক্তি এর স্থান স্বধিষ্ঠান।
চৈল - রৌদ্রীশক্তি-এর স্থান মনিপুর।

এই তিন শক্তির উপরে হৃদয়পদ্মে অনাহতচক্রে আত্মশক্তির প্রতিষ্ঠা করলেই চৈলহিন কুশোত্তর হয়। এখানে অধিষ্ঠান করলে মন আর পার্থিব বিষয়ে চঞ্চলতা উৎপন্ন করতে পারে না।

বাহিরের আপন শুদ্ধি ও দেহের অভ্যন্তরের আসনশুদ্ধি হলেই বাহ্য অভ্যন্তর শুচি মন্ত্রটি বলার সার্থকতা হল। এরপর পূজক তাঁর পূজার কার্য্যে সাধক তাঁর সাধনার কার্য্যে অগ্রসর হতে পারেন।

আপনি কি জানেন

১। আমেরিকার অন্যতম প্রধান ক্রীড়া 'বাস্কেটবল' প্রথম প্রচলন হয়েছিল কানাডায়।

২। সুইজারল্যান্ড-এ গাড়ীর দরজা আওয়াজ করে বন্ধ করলে আইনগত ভাবে শাস্তি পেতে হয়।

৩। ইংরেজিতে সমস্ত মহাদেশগুলির নামের শুরু ও শেষ হয়েছে একই অক্ষরে (alphabet)।

৪। ক্রিকেটের প্রথম আন্তর্জাতিক match হয় ১৮৪৪ সালে, আমেরিকা এবং কানাডার মধ্যে, ম্যাচটি খেলা হয় নিউইয়র্ক St. Georges ক্রিকেট ক্লাবের মাঠে।

৫। ক্রিকেট খেলা প্রথম শুরু হয় চার বল প্রতি ওভার। এরপর সেটা পরিবর্তিত হয় পাঁচ বল প্রতি ওভার। পরবর্তীকালে কিছু দেশ ১৯২২ সালে পরীক্ষাধীন ভাবে আটবল প্রতি ওভার খেলে। সর্বশেষ ১৯৭৯ সালে সর্বসাধারণের গ্রহণযোগ্য করে ছয় বল প্রতি ওভার standardise করা হয় - অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ড ক্রীড়াসূচিতে।

৬। পুরুষ মানুষের জামার বোতাম থাকে ডান দিকে আর মহিলাদের জামার বোতাম থাকে বাম দিকে।

৭। Aircraft-এ যে Black Box পাওয়া যায় তার আসল রঙ Orange।

৮। সারা বিশ্ব প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল খৃষ্টপূর্ব ৭০০ সালে, তৎকালীন ভারতের তক্ষশীলাতে। সারা বিশ্বে থেকে হাজার হাজার ছাত্র বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সেখানে পড়তে আসত।

৯। পৃথিবীর প্রথম দেশ ব্রিটেন যেখানে প্রথম Postage Stampচালু হয়েছিল। ১লা মে ১৮৪০ সালে। এর সৃষ্টিকর্তা ছিলেন Sir Rowland Hill।

১০। হল্যান্ডে, সারা দেশ জুড়ে সাইকেল চালকদের জন্য একটি আলাদা রাস্তা করা আছে।

বেনারসের ঘাটে.....

সমৃদ্ধ দত্ত

বাঙালি মনে হচ্ছে?

হ্যাঁ-সূচক ঘাড় নাড়তে চশমাটা খুলে গায়ের 'এক সময় সাদা ছিল এখন ধুসর' রঙের কাপড়ের খুঁট দিয়ে যত্ন করে মুছতে শুরু করলেন। চশমা পড়া সাধু এই প্রথম দেখছি। তাও আবার বাংলায় কথা বলছেন। ভক্তির থেকেও কৌতূহল বেশি হল। শেষ ডিসেম্বরের শীতে দশাশ্বমেধ ঘাটের রাত। সাড়ে ন'টা বাজেনি। কিন্তু ঘাট যেন দ্রুতই ফাঁকা হয়ে গিয়েছে। একেবারে জনমানবহীন নয়। ইতিউতি কয়েকজনের যাতায়াত রয়েছে। ঘাটের সামনে কিছু চৌকি পাতা থাকে। সেগুলিতে কয়েকজন বসে। কেউ নিবিষ্ট মনে গঙ্গা দেখছেন। কেউ গুনগুন করে সুর ভাঁজছেন। জায়গাটা অন্ধকার মতো। আসলে বেশি অন্ধকার লাগার কারণ হল বেশ কিছুক্ষণ আগে গঙ্গা নিধি সেবার অফিসের কেয়ারটেকার ছেলেটা ঘাটে লাগানো ভেপার আর নিওন ল্যাম্পগুলো নিভিয়ে দিয়েছে। দশাশ্বমেধ ঘাটে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় যে সুন্দর পরিবেশ তৈরি করে, জাঁকজমকপূর্ণ আরতি হয় ,তার আয়াজক এই গঙ্গা নিধি সেবা। গঙ্গা নিধি সেবা-র আরতির একটু আগেই কিন্তু এই ঘাটের ঠিক পাশেই থাকা প্রাচীন দশাশ্বমেধ ঘাটে প্রাচীন আরতিপর্ব চলে। কিন্তু সেই আরতির মাহাত্ম্য তথা ভক্তির কমতি না থাকলেও ঔজ্জ্বল্যের অভাব রয়েছে। আদতে এটিই এই ঘাটের প্রাচীন আরতি অনুষ্ঠান। কিন্তু সত্যেন্দ্র মিশ্র (সভাপতি গঙ্গা নিধি সেবা) এখানে চালু করেছেন যুগের সঙ্গে তাল মেলানো এক নয়া আরতি অনুষ্ঠান। একথা অনস্বীকার্য যে এই নয়া প্রথার আড়ম্বরের কাছে প্রাচীন আরতি ব্যবস্থার অন্তত বহিরঙ্গে জামানত জব্দ হয়েছে। কারণ এখন ঘাটের আরতি মানে ওই নতুন আরতিকেই বোঝায়। গঙ্গা নিধি সেবার আরতিপর্বটি স্রেফ ভক্তির অনুষঙ্গ বহনকারী কোনও রীতি নয়, তার থেকেও অনেক বেশি বিনোদন। সুঠাম শরীরের গ্রীক ভাস্কর্যের মতো মুখশ্রীমণ্ডিত চার যুবক গঙ্গা আর মহাদেবকে আরাধনা করেন। ঝকঝকে পোষাক, গমগমে সাউন্ডসিস্টেমে নিখুঁত ভজন এবং অপরূপ দেহভঙ্গির ঋজুতা একঘন্টা মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে দেশিবিদেশি দর্শক আর ভক্তদের। পুরাণে বর্ণিত রাজাদের অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রিয় স্থল এই ঘাটটি এবং স্বয়ং রঘু বংশের রাজা দশরথও এখানে অশ্বমেধ করেছেন বলে শিহরিত হওয়া নয়, এখন পর্যটকদের কাছে সত্যি বলতে কী দশাশ্বমেধ ঘাটের অন্যতম ইউ এস পি হল, সন্ধ্যার আরতি। সেই আরতি শেষ হয়েছে অনেকক্ষণ। আলো তো নিভেছেই। সংসারী, পর্যটক, ভক্ত পরিবারের ভিড় কমে গিয়েছে। সারাদিন গঙ্গাপুজোর পান্ডারা যেসব সিঁড়ি দখল করে বসে থাকার পর সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরে যান, সেরকমই একটি সিঁড়ির ওপর বসে সাধুবাবা নীচু গলায় কী যেন বলছিলেন। আর জনাচারেক দেহাতি মানুষ কাপড় দিয়ে কান ঢেকে জবুথবু হয়ে গোল হয়ে বসে শুনছে। কাছে গিয়ে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে বসেছিলাম, কি বলেন শোনার জন্য। কানে আসতেই অবাক হলাম। কোনও কথকতা বা ঠাকুরদেবতার গুণগান নয়। বাবাজি দেহাতিদের শেখাচ্ছেন মূল্যবোধ।... কভি দুসরে কী চিজ পর লোভ মাত করনা... রোজ যো খানা মিল রাহা হ্যায়, সমঝ লেনা কী ওহি আপনা নসিব হ্যায়... সবসে বড়ি এক বাত হামেশা ইয়াদ রাখো, অগর কোই গলতি করোগে অর পাকড়ে যাওগে তো তুরন্ত গলতি সিকার কর লেনা... জানতে

হো সবসে বড়াগুণ কেয়া হ্যায়? দেহাতিদের মুখগুলো ওই অল্প আলোতেও যেন চকচক করছিল। মুখে কোনও কথা নেই। বাবাজিই উত্তর দিলেন, 'মুঝসে ভুল হো গয়া'-ইয়ে বোলনা শিখো।

চমকে উঠলাম। বেড়াতে এসে জীবনের এক বড় শিক্ষা পেলাম। ভুল স্বীকার করতে শেখা। সত্যিই তো নিত্যদিনের জীবনের অভিজ্ঞতায় দেখছি নাগরিক সভ্য পেশাদার সমাজে সবচেয়ে বড় কুণ্ঠা যেন ভুল স্বীকারে। অফিসে, বাড়িতে, প্রেমে, পার্বণে, দাম্পত্যে আর আত্মীয়তায় আমরা ক'জন কথায় কথায় দৃপ্ত কণ্ঠে বলতে পারি হ্যাঁ, ওটা আমারই ভুল? বরং ভুল করেছি সেকথা মনে মনে জানলেও নানারকম সাফাই দেওয়ার চেষ্টা করি। উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছি দেখে হঠাৎ যেন সাধুবাবার চটক ভাঙল। কোনও গৌরচন্দ্রিকা ছাড়াই প্রশ্ন—বাঙালি মনে হচ্ছে?

তারপর চশমা মুছে ফের চোখে দিয়ে সামনে থাকা দেহাতিদের বললেন, আচ্ছা ভাই! একজন ফতুয়ার ভেতর থেকে একটা পেয়ারা বের করে আনল। আর একজন ছোট্ট এক শিশি তেল। তারপর একে একে প্রণাম করে উঠে পড়লেন। বাবাজি আমাকে দেখে হাসলেন — নিশ্চয়ই ভাবছেন জ্ঞান বিলি করে গরীব মানুষগুলোর থেকে জিনিসপত্র নিচ্ছি। আসলে কিন্তু ওরাই না দিয়ে পারে না। কারণ আমি নিয়মিত এখানে আসি এমন নয়। আমাকে কবে কোথায় পাবে তাও ওরা জানে না। কিন্তু ওদের রুটিন কী জানেন? এরা কেউ কাজ করে কাপড়ের মিলে কিংবা রাজমিস্ত্রির। থাকে মদনপুরার অলিগলিতে। প্রতিদিন কাজের জায়গা থেকে ফিরে স্নান করে রাতের খাবার খেয়ে এই ঘাটে চলে আসে। তারপর আমারই মতো কোনও না কোনও সাধুর সামনে বসে যায়। স্রেফ দুটো ভাল কথা শোনার জন্য। কেউ রামায়ণের গল্প বলে, কেউ রামচরিতমানস। আমি ওসব বলি না। আমি শুধু সেসব কথাই বলি যেগুলো ওদের রোজকার জীবনে মেনে চললে কিছুটা হলেও শুদ্ধ আত্মা তৈরি হবে। যার কাছেই কিছু শুনুক, ওরা সকলেই কিন্তু রোজ বাড়ি থেকে আসার সময় সঙ্গে কিছু নিয়ে আসে। যত নগণ্যই হোক সেটা দেবে। ওদের দর্শনটা হল, সাধুজী আমার আত্মশুদ্ধির জন্য এতসব কথা বলছেন। আর আমি শুধু খালি হাতে শুনে যাব! তা হতে পারে না। এর থেকে বড় মূল্যবোধ কি আছে বলুন তো? আমার চোখ থেকে কৌতুহলের চাদর সরছে না দেখে এবার হেসে ফেলেন তিনি। আপনার পরের প্রশ্নটা নিশ্চয়ই আমাকে নিয়ে? একজন বাঙালি চশমা পরা সাধু। কেন এলাম, কোথায় বাড়ি ছিল, কতদিন আছি! আমি কিন্তু আপনাকে প্রশ্ন করিনি। আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় হল। আলাপের স্থল হিসেবে রইল এই ঘাটই। যখনই আসবেন এখানেই না হয় দেখা হবে। সে কাল রাতে আসুন কিংবা আবার ১৬ বছর পর। বলে হাঃ হাঃ করে অট্টহাসি হেসে বাবাজি বললেন, আপনার কিন্তু আমাকে দেখে হিংসা হচ্ছে। সংসারের চৌহদ্দিতে পাক খেতে খেতে আপনার মাঝে মধ্যেই মনে হয় যাই একটু একা বেরিয়ে পড়ি। কিন্তু পারেন না। কারণ ছুটি তো পাবেন ক'টাদিন। আর তখনই মনে হবে পরিবার ছাড়া যাই কীভাবে। এদেরই বা আমি ছাড়া কে আছে? মুখে হাসি ঝুলিয়ে রেখে এই চরম সত্য শুনছি দেখে বাবজি কাছে সরে এলেন। ফিসফিস করে গোপন কথা বলার ভঙ্গিতে বললেন, কতদিন স্রেফ নিজের মতো করে একা একা বেরিয়ে পড়তে পারেননি বলুন তো? বলে ফের হাসি। এবং সত্যিই সেই বইয়ের পাতায় বহুবার পড়া লাইনের মতোই দ্রুত অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেন।

সাধুসাহেব কী বলছিল? ছপছপ শব্দে ঘাটের সিঁড়ি দিয়ে উঠে প্রশ্ন করলেন আনন্দ পান্ডে। দশাশ্বমেধ ঘাটের গঙ্গাপুজোর পান্ডা। প্রথমদিন ঘাটে আসার পর প্রথম আলাপ হয়েছিল এঁর সঙ্গেই। হোক শীত। কাশীতে এসে গঙ্গায় ডুব দেব না? এই ভেবে একদিন রোদ চড়তেই হাজির হয়েছিলাম ঘাটে। কিন্তু নামেই গঙ্গাস্নান। দশাশ্বমেধ ঘাটে স্নানের জায়গা পাওয়াই দুষ্কর। নৌকা আর বজরায় ভর্তি ঘাটের সামনেটা। সামান্য জল। সেখানেই পুণ্যি সারছেন হাজারো মানুষ। তবে এই ঘাট ছেড়ে দূরের দণ্ডপাণি, দুর্গাবটি, শীতলা, সোমেশ্বর ইত্যাদি ঘাটে গেলে এত নৌকার উৎপাত নেই। কয়েকটা ডুব দিয়ে উঠতেই আনন্দের মুখোমুখি। আসুন গঙ্গাপুজো করিয়ে দিই। ভাবলাম নির্ঘাৎ এবার গালে চড় মারবে। পুজোর নামে একগুচ্ছ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার ফিকির। মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, বাবুজি যা মনে চায় তাই দেবেন। না দিলেও কিছু মনে করব না। সন্দেহ যায় না। ধুর! ওরকম সবাই বলে। তারপর খপ্পড়ে পড়লে সব পান্ডারা ছুটে আসবে। তখন গচ্চা। তবে তারপর সত্যিই যত্ন নিয়ে পাশে বসিয়ে শুদ্ধ মন্ত্র পরিয়ে হাতে তাগা পরিয়ে মাত্র ১০ টাকায় মহাখুশি হয়ে যখন গঙ্গাজল দিয়েই আবার মাথা ভিজিয়ে আশীর্বাদ করলেন, ভাবলাম নাগরিক সভ্যতার সবচেয়ে বড় শাস্তি হল অবিশ্বাস করে ঠকা।

তা সেই আনন্দপান্ডে এই রাত সাড়ে ন'টার সময়ও ঘাটে কী করছেন? সিঁড়ির নীচে খুপড়ি। সেখান থেকে জামাকাপড় বের করে পরে নিলেন। আবার প্রশ্ন, তা কী বলল সাধুসাহেব? সাহেব কেন? আনন্দ পান্ডে বললেন, ওরে বাবা। উনিই তো আমাদের মধ্যে একমাত্র ইংরাজি জানেন। চটাপট ইংরাজি। যত সাহেব মেমসাহেব এখানে আসে আর ওই মাঝিদের সঙ্গে দরদস্তুর করে তখন বিধিব্যবস্থা করেন তো উনিই। তাছাড়া যখন উদয় হন তখনই সাতসকালে বাচ্চাদের ডেকে ডেকে ইংরাজি পড়াতে শুরু করেন। কিন্তু একটাই দোষ। কোথাও মন টেঁকে না। এই যে আছেন দেখছেন? কয়েকদিন পর ধাঁ। আবার হয়তো মাস দেড়েক পর উদয় হবেন। তা তো বুঝলাম। তা আপনি রোজএখন বাড়ি ফেরেন নাকি? আনন্দ ভেজা ধুতি প্লাস্টিকের ব্যাগে ঢুকিয়ে বললেন, হ্যাঁ এরকম সময়েই বেরোই। মণিকর্নিকা ঘাটের দিকে যেতে এক কোণে তাঁর সাইকেল দাঁড় করানো। কোনদিকে আপনার বাড়ি? আনন্দ এবার থেমে গেলেন। কোনদিকে কী বলছেন? বলুন কোন গাঁয়ে।

আমি অপ্রস্তুত। বললাম, ও আপনার বেনারসে শহরের মধ্যে বাড়ি না।

— শহর কী বলেন! আরে আমি থাকি ইশারগঞ্জ। এখান থেকে ৬৪ কিলেমামিটার। আমি হাঁসব না কাঁদব! বলে কী লোকটা! ৬৪ কিলোমিটার পথ সাইকেলে করে রোজ আসে আর যায়? স্রেফ গঙ্গাপুজো করিয়ে রোজগারের জন্য? এত দারিদ্র?

আপনার গাঁয়ের আশেপাশে কিছুই কাজ জুটছে না? এতটা পথ আসতে যেতেই তো আপনার সময় আর শরীর ভেঙ্গে যাচ্ছে?

কাজ? আনন্দ সাইকেলের দিকে এগোতে গিয়ে থমকায়। কাজের কী দরকার? ও হো, আপনি বুঝি ভাবলেন আমি রোজগারের জন্য এত কষ্ট করি। আরে না না। আমার ছেলেদের মাটি তোলার ব্যবসা আর লরি আছে। আমার ওপর ওরা খেপে থাকে এভাবে রোজ আসি বলে। এখানেই

সোনারপুরায় চাকরি করতাম মিউনিসিপ্যালটির ড্রেনেজ সেকশনে। চাকরির সময় রোজ আসতাম। এখনও আসি। কেন জানেন। লোক দেখতে। ওটাই আমার নেশা। নতুন নতুন লোকের সঙ্গে দেখা হবে। কথা হবে। সুখদুঃখের কথা বলবে। লোক দেখার জন্য রোজ ১২৮ কিলোমিটার পাড়ি দেওয়া সাইকেলে। জয় বাবা বিশ্বনাথ।

: : :

তখন সূর্য ওঠেনি। 'কুয়াশার রং নীল' কথাটা কোনও গল্পের নাম হবে অথবা সিরিয়ালের, ঠিক মনে পড়ছিল না। কিন্তু সেদিন ভোরে প্রচণ্ড ঠান্ডায় কাঁপতে কাঁপতে যখন হংকং ব্যাংকের হলিডে হোমের সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে আধ মিনিটের মধ্যে দশাশ্বমেধ ঘাটে এসে দাঁড়ালাম, প্রথম ওই কথাটাই মনে পড়ল —কুয়াশার রং নীল। সত্যিই নীল। অন্তত শীতের ভোরে বেনারসের গঙ্গাতীরে। হংকং ব্যাংকের হলিডে হোমটি অনবদ্য শুধুমাত্র লোকেশনের জন্য। হলিডে হোম মানে আদতে প্রাচীন বারাণসীর একটি বাড়ি। একেবারে পুরানো দশাশ্বমেধ ঘাটের গা ঘেঁষে। তিনতলার যে ঘরটায় ছিলাম। সেটা আসলে একটা পরিপূর্ণ স্যুইট বলা ভাল। প্রথমে একটা ছোট ঘর, তারপর একটা বড় ঘর এবং সেই বড় ঘরের শেষপ্রান্তের দরজাটা খুললেই হুড়মুড় করে গঙ্গার হাওয়া ঢুকে পড়বে। ওটা একটা প্রশস্ত ছাদ। কোমরসমান পাঁচিল। সমস্যা একটাই মাঝেমধ্যেই লালমুখো বাঁদর ঢুকে পড়ে। এই বাড়িটির মালিক এক বাঙালি। প্রদীপ চৌধুরী। বনেদী এবং তিন পুরুষের প্রবাসী বাঙালি। তিনমহলা বাড়ির দোতলায় নিজে থাকেন পরিবার নিয়ে। আর বাকি অংশ হলিডে হোমের জন্য কয়েকটি সংস্থাকে ভাড়া দেওয়া। বারাণসী স্টেশনে নেমে রিকশায় চেপে কলকাতা লজের দিকে যেতে যেতে জটায়ু কয়েক সেকেন্ড পরপর হাতজোড় করে কপালে ঠেকাচ্ছেন। আর পাশে বসা তোপসে হাসতে হাসতে বলছিল, এক কাজ করুন না। আপনি হাতটা কপালেই ঠেকিয়ে রাখুন। একগাল হেসে জটায়ু এরপর প্রশ্ন করেছিলেন পাশের রিকশয় বসা ভদ্রলোককে — কাশীতে কত মন্দির আছে মশায়? আপাত নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে রসিক ফেলুদার জবাব ছিল — তেত্রিশ কোটি। এবং ফেলুদা যে বিন্দুমাত্র ভুল বলেনি তার প্রমাণ বারণসীর প্রতিটি পদক্ষেপে। এই গৌরচন্দ্রিকার কারণ হল আমাদের হলিডে হোমে পর্যন্ত অর্থাৎ প্রদীপবাবুর তিনপুরুষের বাড়ির দেউড়ি পেরিয়ে ঢুকলে সেখানেও একটি ছোটখাটো শিবমন্দির রয়েছে। বিশ্বনাথ গলি থেকে দশাশ্বমেধ ঘাট পর্যন্ত যেতে যে কত ইতিউতি মন্দির রয়েছে তা অগুন্তি। যা বলছিলাম। সূর্য ওঠার আগে দশাশ্বমেধ ঘাটের রূপ দেখার অদ্ভুত তৃপ্তি রয়েছে। প্রথমদিন ভোরের ঘুম আর কাশীর পৌষের শীতকে অগ্রাহ্য করে উঠে সোজা ঘাটে চলে যাওয়ার পর আর যে ক'দিন ছিলাম তার পর একদিনও মনে হয়নি না গেলেও চলবে। বরং ঘুম ভেঙে যাওয়ার জন্যই অ্যালার্ম দিয়ে রাখতাম আর পাঁচটায় বেরিয়ে পড়তাম গঙ্গার সামনে। নীল রঙের কুয়াশার মধ্যেই বারাণসীর ঘাটের ট্রেডমার্ক হিসেবে চিহ্নিত বিভিন্ন ঘাটের সিঁড়ির চতুর্দিকে গোল আটকোণা ধাপগুলির একটিতে গিয়ে বসতাম। সেই রাত আর ভোর দুয়েরই আভাস থাকা ক্ষণটিতে বেনারসের ঘাট সব আবর্জনা আর কোলাহলের চিহ্ন মুখে প্রকৃত এক অপার্থিব পবিত্রস্থল হয়ে ধরা দেয়। আবছা দূর থেকে দেখা যাচ্ছে রামনগরের রাজার প্রাসাদ। দু - একটি নৌকা মাঝগঙ্গায় যেন সময়কে স্থির করে রাখার ব্রত নিয়ে অচঞ্চল দাঁড়িয়ে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে আকণ্ঠ গঙ্গার জলে নিমজ্জিত কিছু সাধু, কিছু সাধারণ মানুষ আর পূণ্যাকাঙ্খী বৃদ্ধা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কেউ ডুব দিচ্ছেন না। সকলের হাত বুকের কাছে জোড় করে রাখা আর চোখ সামনের পূবাকাশে। অপেক্ষা সূর্যোদয়ের। বাঁশের কঞ্চি আর পাতায় তৈরি বেনারসের ঘাটের পরিচিত সেই দণ্ডওয়ালা ছাতার নীচে কখন যেন এসে হাজির কয়েকজন কথকঠাকুর। সিঁড়ির একেবারে ওপরের ধাপে পালোয়ানের কসরৎ চলছে। সূর্য ওঠার আগে পর্যন্ত এই যে বেনারসের ঘাটের দৃশ্য তা যেন আবহমানকালের। ঠিক এই ক্ষণেই সময় যেন থমকে যায়। ঠিক তখনই কানের পাশে মৃদু শব্দ-বাবুজী চা! শুধু চোখ আর নাক বেরিয়ে আছে। বাকিটা কালো চাদরে ঢাকা। ছোট শরীর। তবু চোখের উজ্জ্বলতা দেখেই টের পাই কুন্দ। বড়জোর আট থেকে দশ বছর বয়স। ক'দিন ধরেই দেখছি সন্ধ্যা হলেই ঘাটে হাজির হয়ে যায় প্রদীপ আর ফুলের ডালা হাতে। ১০ টাকা আর ৫ টাকার ডালা। আমাকেও গছিয়েছে। ওর কাছে কেনা ডালার প্রদীপ জলে ভাসানোর পরও নাকি ডুববে না, নিভবেনা। আমারটা অবশ্য একটু গিয়েই উল্টে যায় নৌকায় ঠোক্কর খেয়ে। তা সন্ধ্যায় ডালা বিক্রি আর সকালে চা? কুন্দন হাসে। সকালে আমার বাবুজি কারখানায় যায়। মা বাবুজিকে খাবার বানিয়ে দেওয়ার সময়ই এক কেটলি গরম চা করে আমাকে ঘাটে পাঠিয়ে দেয়। যা আয় হয়। এই সময় তো অনেক ট্যুরিস্ট ঘাটে আসে। বিক্রি হয়েই যায়। থাকিস কোথায় তুই? বাড়ি গোধুলিয়া মোড়ের পাশে চার্চের গলিতে। ওখান থেকে এই শীতে কেটলিতে চা নিয়ে আসতে আসতেই তো ঠান্ডা হয়ে যাবে? কুন্দন আবার হাসে-আরে বাবুজী আমি হেঁটে আসি নাকি। এক দৌড় লাগাই। আর আমি আসার আগেই রামলগনজীর দোকান খুলে যায়। তখন ওখানে আবার গরম করে নিই। তার মানে তুই আমাদের বারবার গরম করা চা খাওয়াচ্ছিস? আমি কপট রাগ দেখিয়ে বলি। কুন্দনের মুখ পলকে কালো হয়ে যায়। বাবুজি বিশ্বাস করুন। একবার গরম করা চা যদি বিক্রি নাও হয়, আমি ফেলে দিই। মা আমাকে বলে দিয়েছে, শিবজীর মন্দিরে একবার যাওয়ার পর অন্যায় কাজ করলে শিবজী পাপ দেবেন। আমার আর বড় হওয়া হবে না। এবার আমারই হাসি পেয়ে যায় —বড় হয়ে কী হবি তুই?

কুন্দন একটু যেন লজ্জা পায়। আমি আবার বলি বল না! এবার অস্ফুটে বলে আমি ট্যুরিস্ট হতে চাই। আমি অবাক। ট্যুরিস্ট হতে চাস মানে? এটা আবার কী হওয়া? কুন্দন এবার মুখ তুলে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, মা বলে, কুন্দন, কীভাবে খাওয়া জুটবে, কীভাবে একাট কাজ পাওয়া যায় আর কোথায় থাকব, সেই চিন্তায় জীবন কেটে গেল আমাদের। আজ পর্যন্ত বেনারসেরএই গোধুলিয়া থেকে দশাশ্বমেধ ছাড়া আর কোথাও গেলাম না। দেখলাম না। আর কতদূর থেকে বছরভর ট্যুরিস্ট আসছে। আমরা কোনওদিন ট্যুরিস্ট হতে পারলাম না। তুই অন্তত এমন কিছু করিস যাতে এই চৌহদ্দি ছাড়াও কোথাও বেড়াতে যেতে পারিস। যেখানে অন্যদের চোখে তুই ট্যুরিস্ট। সাহেব আমার মায়ের বড় ইচ্ছে আমি যেন একদিন ট্যুরিস্টহই। তাই মিউনিসিপ্যালিটির স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছে।

সেদিনই ঠিক করেছি বিশ বছর পর এবার অন্তত বেনারসে যাব। খোঁজ নেব কুন্দন ট্যুরিস্ট হতে পারল কি না!

ছোটবেলার দিনগুলি

বিপ্লব দাশগুপ্ত

প্রথম পর্ব

ছোটবেলাকার দিনগুলির কথা ভাবলে সমস্ত শরীরে যেন একটা রোমাঞ্চ শিহরিত হয়। একটা বিরাট নোস্টালজিয়া সারা শরীর মনকে অবশ করে দেয়। মনটা rewind হয়ে পৌঁছে যায় অনেক পিছনে। শুভঙ্কর বসে আছে রোজকার মত বাগানের ধারে তার ইজি চেয়ারটায়। সকালের এই সময়টায় একা একা বাগানটার ধারে বসে ভাবতে ভালো লাগে। জীবনটা যখন তার নিজের গতি ধরে চলে, তখন সে স্রোতস্বিনী নদীর মত বহে যায় নিজের গতিপথে। একুল ভাঙে তো ওকুল গড়ে। এই ভাঙাগড়ার খেলা খেলতে খেলতে তার মনে থাকে না পিছন ফিরে তাকাবার। মানুষের জীবনটাও তাই। সময় এগিয়ে যায়। জীবনের গতিও এগিয়ে চলে । নিজের গতিতে চলতে চলতে নদী নিয়ে চলে ভূখণ্ডের রাশি, জমিখণ্ডের মাটি। তারপর একদিন সে ক্লান্ত হয়, তখন তার গতি মন্থর হয়। সবশেষে নদীর ধারা ক্ষীণ হতে হতে তার গতি মন্থর হতে হতে সে মিশে যায় সাগরে। জীবনটাও ঠিক তাই। প্রকৃতির বদলের সাথে সাথে সে বয়ে চলে, অন্তে মিলিয়ে যায় শূন্যে। এ যেন আদি অনন্তকালের এক জীবনমুখী সঙ্গীত। একটা symphony orchestra .....সমানে এক সুরে বেজেই চলেছে। থামবার অবকাশ নেই। তার চলার পথে নতুন নতুন জীবনকে জাগিয়ে তোলে তারপর কে কোথায় হারিয়ে যায় তার হিসেব নেবারও অবকাশ নেই। কিন্তু সেই জীবনের ক্লান্তি আছে। তার অবসাদ আছে। চলতে চলতে এক সময় সে ক্লান্ত হয়। জীবন তার গতি সম্পূর্ণ থেমে যাওয়ার আগে এক বাস্তবাস্থায় দাঁড়িয়ে পড়ে। মানুষের মন তখন খুঁজে পায় কিছু সময় নিজেকে বিশ্লেষণ করার। নিজেকে rewind করে মানুষ দেখতে চেষ্টা করে তার ফেলে আসা দিনগুলো। এ যেন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখা। নিজের শরীরটা ঘুরিয়ে বেঁকিয়ে, বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি করে দেখার চেষ্টা তার কোন অবয়বটা দেখতে সুন্দর লাগে।

শুভঙ্করের জীবনেও বোধহয় আজ সেই সময় এসেছে। তাই নিজের জীবনটা নিয়ে ভাবতে ইচ্ছেকরে। নিজেকে নিয়ে যেতে ইচ্ছে করে পিছনের দিনগুলিতে। নিজের ভাবাবেগ নিজেকেই তাড়িয়ে নিয়ে চলে। এখানেই বোধহয় সব থেকে ব্যস্ত থাকে মানুষের মন। একটা সেতুর মত সে কাজ করে পুরোনো, ফেলে আসা জীবন আর বর্তমান জীবনের সাথে যোগসূত্র স্থাপন করতে। এটাই হয়ত প্রকৃতির একটা অঘোষিত নিয়ম।

শুভঙ্করের মন চলে গেছিল জীবনের অনেক পিছনে, সেই ছোটবেলাকার দিনগুলোতে। মনে পড়ে যায় তার ছোটবেলার খেলার সাথী যূথীকে। ওদের দুজনের পরিবার একই সঙ্গে থাকত লেকপেলসের এক ভাড়া বাড়িতে। শুভঙ্করের পরিবারে ছিল ওরা দুই ভাই আর ওর বাবা-মা। ওদের বাড়িটা ছিল দোতলা। বাড়িওয়ালা তাঁর পরিবার নিয়ে থাকতেন দোতলাতে। বয়স্ক ভদ্রলোক কিছুকাল আগে রিটায়ার করেছেন, শুভঙ্কর ওনাকে দাদুভাই বলতো, নীচে ওরা তিন ঘর ভাড়াটে ছিল। বাড়ির সামনের দিকে দুটো করে ঘর নিয়ে শুভঙ্কররা আর একটা পরিবার থাকত। যূথীরা থাকত পিছনের দিকে। এটা ছোট গলি দিয়ে যেতে হত। পিছনের দিকে যূথীর বাড়িতে। ওরাও তখন দুই ভাই এক বোন আর তাদের বাবা-মা। ভিতর দিক থেকে ওদের বাড়িতে যাবার আর একটা রাস্তা ছিল। ওদেরও দুটো ঘর ছিল। সারা বাড়িটায় সবাই মিলে এমন জমিয়ে থাকত যে মনে হত ওদের সকলকে নিয়ে যেন একটা বিরাট একান্নবর্তী পরিবার ওই বাড়িটাতে বাস করছে।

যূথী যদিও ওর থেকে কিছু ছোট ছিল কিন্তু খুব খুনসুটি করত। ওর বয়স তখন হবে পাঁচ কি ছয়। শুভঙ্করের বয়স হবে দশ, যূথীর ডবল। কিন্তু ওরা একসঙ্গেই খেলত। শুভঙ্করের বাবা অফিস বেরিয়ে গেলে ওদের খেলা শুরু হত, যূথীর বাবারও তখন অফিস যাবার সময়। উনি বাইরের দরজায় নিজের পা রাখলেন কি না, যূথী ভিতেরর দরজা খুলে চলে আসত ওদের বাড়ি। ওদের বাড়িতে ঢুকেই সোজা চলে যেত শুভঙ্করের মায়ের কাছে, নালিশ হত শুভঙ্করের নামে গতকাল সারদিন কি কি অন্যায় কাজ করেছে শুভঙ্কর ওর সাথে। ওর বইয়ের মধ্যে জলছবি সাপটে দিয়েছে, ওদের বিড়ালের দুধ খাবার বাটিতে দুধের মধ্যে নূন মিশিয়ে দিয়েছে। ওকে নাকি বলেছে গরুরা ঘাস খাবার সময় পুরোটা খায় না, ওদের গলার তলায় একটা থলি আছে, সেখানে জমিয়ে রাখে, এইরকম কত কিছু কখনো কখনো শুভঙ্কর খুবরেগে যেত। যূথীর চুলের মুঠিঠা ধরবার জন্য এগিয়ে যেতেই, যূথী টুক করে শুভঙ্করের মায়ের আঁচলে লুকিয়ে পড়ত। শুভঙ্করের মা তখন রান্না শেষ করতে ব্যস্ত। যূথী এমন করে আঁচলে জড়িয়ে যেত যে ওর মা নিজের ভারসাম্যটাই হারিয়ে ফেলত, যূথী শুভঙ্করের মার আঁচলের ফাঁক দিয়ে মুখটা বের ওর লম্বা জিভটা দেখাত। ততক্ষণে শুভঙ্করের মা শুভঙ্করকেই বকা শুরু করে দিত। কী বলবে শুভঙ্কর। রান্নাঘর ছেড়ে বাইরের ঘরে চলে আসত। হাতের লেখার খাতাটা বের করে নিত।

শুভঙ্করের মা রান্না শেষ হলে ভিতরের দরজার গণ্ডী পেরিয়ে চলে যেত পিছনের বাড়িতে যূথীর মার সাথে গল্প করতে। আর যূথী তখন এক ঝটকায় চলে আসত শুভঙ্করের ঘরে। পিছন থেকে শুভঙ্করের কানের কাছে মুখ এনে বলত, "ঠিক হয়েছে! ঠিক হয়েছে!" শুভঙ্কর রেগে মারতে উঠতেই দুপা পিছিয়ে গিয়ে বলত "আমি কিন্তু বৌদির কাছে আবার গিয়ে বলে দেব।" হ্যাঁ, শুভঙ্করের মাকে যূথীরা 'বৌদি বলত। আবার বকুনি খাবার ভয়ে শুভঙ্কর বলে উঠত, 'ঠিক আছে আমি কিছু করছি না.... যা বোলগে যা... কর নালিশ... এবার পাবি একটা মস্ত বড় বালিশ।" বিরাট করে নিজের জীভ দেখিয়ে যূথী চলে যেত। কিন্তু চুপ থাকতে পারত না। ওদেরই ঘরের সামনে ঘুরে বেড়াত। শুভঙ্করেরও অস্বস্তি লাগত। ওর মন চাইত যূথীকে আরও একটু রাগায়। নিজের লুকোনো জায়গা থেকে কাগজের ঠোঙায় মোড়া কাঁচা আমগুলো বার করত। ওর বাবার দাড়ি কামানোর জায়গা থেকে একটা ব্লেড বের করে আমের মুকুলগুলো ছিলতে বসত। সেই ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই বাড়ির ভিতরের বাগান থেকে আমের মুকুলগুলো কুড়িয়ে লুকিয়ে রেখেছিল। ওদের বাড়ির ভিতরের বাগানে একটা আমগাছ ছিল, অনেক আম হত রোজ ভোরবেলা ওরা দুইভাই বিছানা ছেড়ে উঠেই চলে যেত বাগানে, কিংবা রান্নাঘরের ছাদে। কেউ দেখার আগে সেখান থেকেই কুড়িয়ে নিত রাতে ঝরা আমের

মুকুলগুলো। একেবারে ছোটগুলো একটু কষ্ট্যা হত, সেগুলো নিত না, কিন্তু একটু বড় হলেই তাতে রস ধরত, তখন সেগুলো ছাল ছাড়িয়ে নুন মেখে খেতে খুব ভাল লাগত।

এই সময়টা শুভঙ্করের কাছে খুবই পছন্দের ছিল। ওকে বকাবকি করার কেউই ধারে কাছে থাকত না। মা তখন জমিয়ে পাশের বাড়িতে আড্ডা দিচ্ছে, দুপুর বারটা বেজে গেলে মা ফিরবে স্নান করার জন্য, শুভঙ্কর আর ওর ভাই দীপুর স্নানতো সকালেই হয়ে গেছে। ওদের বাবা অফিসে যাবার আগেই নিজের সাথে নিয়ে কলতলায় যায় ওদের স্নান করিয়ে নিজে স্নান করে। সুতরাং শুভঙ্করের কাছে এখন অফুরন্ত সময়। যূঁথীকে দেখিয়ে আমের মুকুলগুলো বার করে ছিলতে বসল। দীপু সবসময়ই ওর পাশে থাকে। ওরে বিশ্বস্ত পার্টনার। যূঁথীরও লোভ হল আম খাবার। ওদের আম কাটতে দেখে দৌড়ে এসে পাশে দাঁড়াল, "শুভদা, আমাকে দেবে?" শুভঙ্করের আগের রাগটা এখনও যায়নি। একটু রাগ দেখিয়ে বলে উঠল, "না পাবি না.. যা।" ওর কথা শুনে যূঁথীর চোখটাও ছলছল করে উঠল। সেই দেখে শুভঙ্করের আর একটু তাতাবার ইচ্ছে হল। ওর দিকে তাকিয়ে বলে উঠল 'যা.. না...যা... মায়ের কাছে আর কি কি নালিশ করার আছে, করে আয়।" এবার মুখ খুলল যূঁথী, "ঠিক আছে আমায় আম দেবে না তো? আমি যাচ্ছি, বলবতোমরা আম খাচ্ছ লুকিয়ে লুকিয়ে, 'যূঁথী যেই চলতে উদ্যত হল, শুভঙ্কর দৌড়ে গিয়ে ওর হাত ধরে আটকাল। ওর মনে হল সত্যি সত্যিই যদি যূঁথী ওদের আম খাওয়ার কথা বলে দেয় তবে তো ওদের ভাগ্যে বেজায় বিড়াম্বনাআছে। তাই শুভঙ্কর উঠে গিয়ে যূঁথীর হাতটা ধরে একটু আশ্বাসের ভঙ্গীতে বলে উঠল, 'ঠিক আছে, তুই মাকে বলবিনা তো, আমরা আম খাচ্ছি?' যূঁথী ঘাড় নেড়ে ওর সম্মতি জানাল, 'না', ব্যাস ওকে নিয়ে এল শুভঙ্কর ওদের দলে। যূঁথী রান্নাঘর থকে লুকিয়ে একটা কাগজে মুড়ে নুন নিয়ে এল। তিনজনে মিলে জমিয়ে জিভের আওয়াজ করতে করতে কাঁচা আমগুলো খেল। সব খাওয়া শেষ হলে, আমের খোসাগুলো ওই কাগজে মুড়ে পিছনের বাগানে ফেলে দিয়ে এল।

যূঁথীর উপর মাঝে মাঝে ভীষণ রাগ হত, ও নালিশ করত বলে, কিন্তু যূঁথীও ওদের সঙ্গ ছাড়ত না। ওদের বাড়িতে যূথীর খোলা দরবার ছিল। শুভঙ্করের বাবাও ওকে ভীষণ ভালবাসত, বাবা অফিস থেকে এলে চুপটি করে বাবার পাশ ঘেঁষে এসে বসত। শুভঙ্করও সেটা চাইত, কারণ ওর বাবা ভীষণ রাগী ছিল। পান থেকে চুন খসলেই শাস্তি ছিল বেত্রাঘাত। শুভঙ্কর আর ওর ভাই দীপুও ভীষণ দুষ্টু ছিল। সারাদিন দুজনে দুষ্টুমি করে বেড়াত। ফলে পাড়ার লোকেরা, শুভঙ্করের বাবা অফিস থেকে ফিরলেই একে একে হাজির হয়ে যেত নিজেদের নালিশ নিয়ে। ওর বাবার কাছে শাস্তি খাবার ভয়ে শুভঙ্কর আর তার ভাই জুবুথুবু হয়ে থাকত। ওই সময়টায় যূঁথী খুব সাহায্য করত ওদের দুই ভাইকে। কেউ এলেই যূঁথী এগিয়ে যেত দরজার কাছে, তারপর তার হাত ধরে টেনে নিয়ে যেত একটু আড়ালে। কিছুক্ষণ বাদেই ওরা চলে যেত। শুভঙ্করের বাবা কিছু জিজ্ঞাসা করলেই মিষ্টি হেসে জবাব দিত, "ওরা মিছেমিছি তোমায় রাগাতে চায়। তুমি যদি শুভদাকে শাস্তি দাও তো ওরা দেখে মজা পায়।

শুভঙ্করের বাবা বলে উঠ, 'দুষ্টুমি করলেতো শাস্তি পেতেই হবে।' যূঁথী খুব সহজভাবেই ওর বাবার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে বলত, 'তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা কর... ওদেরকে জিজ্ঞাসা কোরো না তোমার যা শাস্তি দিতে হয় এখন দাও। ওদেরকে দেখিয়ে দিও না।.. ওদের ছেলেরাও তো দুষ্টুমি করে ওদের বাবা মা কেন ওদের শাস্তিদেয় না?' শুভঙ্করের বাবা কোনো জবাব খুঁজে পায় না। চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ তারপর পড়ার সময় হয়ে যায়, যূঁথীও চলে যায় ওদের ঘরে।

শুভঙ্করের মনে পড়ে একদিন খুব গণ্ডগোল হয়ে গেছিল। যূঁথী কোথা থেকে কিছু টক-মিষ্টি,লজেন্স এনেছিল, বোধহয় কেউ খেতে দিয়েছিল। যূঁথী কখনো একা কিছু খেতে পারত না। সেদিনও দুটো লজেন্স লুকিয়ে যূঁথী শুভঙ্কর আর দীপুকে দিয়েছিল। ব্যাপারটা বিকেল বেলা ঘটেছিল। দীপু কড়মড় করে ওর লজেন্সটা খেয়ে নিল। কিন্তু শুভঙ্কর গালে রেখে দিল ওর লজেন্সটা। হঠাৎ ওর বাবাকে অফিস থেকে ফিরতে দেখেই তাড়াতাড়ি লজেন্সটা পকেটে ঢুকিয়ে রেখেছিল। লজেন্সটা ওর পকেটেই থেকে গেছিল, সময় গড়িয়ে গেল, ব্যাপরাটা শুভঙ্করের মন থেকেই মুছে গেছিল। কিন্তু পড়তে বসার সময় পকেটে হাত দিতেই, হাতে আঠার মত কিছু লাগল। তখনই মনে পড়ে গেল শুভঙ্করের লজেন্স-এর কথাটা ভয়ও ধরল মনে । কোথাও একটা ফেলে দিয়ে চেয়েছিল চুপিচুপি। কিন্তু সুযোগই পাচ্ছিল না। বারে বারেই হাতটা পকেটের দিকে চলে যাচ্ছিল । এই ব্যাপারটা একসময় ওর বাবার নজরে পরে যায়। ওকে ডেকে জিজ্ঞাসা করে, "কী ব্যাপার, তোর পকেটে কী আছে?" শুভঙ্কর ঘাবড়ে গেল। আমতা আমতা করে বলে উঠল, 'কিছু না'। কিন্তু ওর বাবা মানবার নয়, ওকে ডেকে নিল, নিজেই ওর পকেটে হাত ঢুকিয়ে লজেন্সটা টেনে বার করল, ব্যস্ এবার ধরা পড়ে গেছে, মিথ্যে কথা বলেছিল, 'কিছু না' ওর বাবা এবার রাগতভাবে জিজ্ঞাসা করল, 'কে দিল এই লজেন্স?' শুভঙ্কর কিছু বলতে পারে না। যূঁথীর নামও নিতে পারছেনা। তাতে যদি মহা হুলুস্থুলু বেধে যায়? ওর বাবা আরও শক্ত করে জিজ্ঞাসা করল, "তুই কিনেছিস লজেন্স? শুভঙ্কর নিরুত্তর, 'পয়সা কোথায় পেলি? পয়সা চুরি করেছিস?' শুভঙ্কর তখনও নিরুত্তর, কী জবাব দেবে খুঁজে পাচ্ছে না। ঠাস্ করে এক বিরাশী মন ওজনের সিক্কা পড়ল ওর গালে। কেঁদে উঠেছিল শুভঙ্কর। থাপ্পড়ের ওজনটা এতই ভারী ছিল যে আওয়াজ চারিদিকে বেজে উঠেছিল, যুঁথীও ওর ঘরে বসে শুনতে পেয়েছিল। তারপই কানে গেছিল শভঙ্করের কান্নার আওয়াজ। যূঁথী দরজায় কান পেতে শুভঙ্কর আর শুভঙ্করের বাবার কথাগুলো শুনছিল । ও বুঝতে পেরেছিল ব্যাপরাটা। ও ভাবল ওর যাওয়া উচিত। দু বাড়ির মধ্যেকার দরজা তখন খিল পড়ে গেছে। যূঁথী দরজার খিল খুলে দৌড়ে নিজের চোখ মুছতে মুছতে শুভঙ্করের বাবার সামনে নালিশ করার ভঙ্গীতে এসে হাজির হল। রীতিমত একটা নাটকীয় ভঙ্গিমায় বলে উঠল, 'ওটা আমার লজেন্স, আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিল শুভদা, আমাকে খেতে দেবে না বলে। বলে লজেন্স খেলে নাকি পেটে পোকা হয়।' যূঁথীর আচমকা কথা শুনে শুভঙ্করের বাবা 'থ' বনে গেছিল। যূঁথী বলেই চলল, "আমি কত করে বললাম, এবারটার মত দাও, আমি আর খাব না। কিন্তু শুভদা শুনলনা। আমার কাছ থকে লজেন্সটা ছিনিয়ে নিজের পকেটে রেখে দিল, পরে ফেলে দেবার জন্য।' একটু থেমে এদিক ওদিক দেখে আবার বলল, 'আমাকে দাও না গো আমার লজেন্সটা?' কথাটা বলেই যূঁথী ওর হাত মেলে দিল শুভঙ্করের বাবার মুখের সামনে। কী বলবে আর শুভঙ্করের বাবা, শেষপর্যন্ত যূঁথীর উপরই রাগ করে বলল, 'না তোমাকেও

খেতে দেব না। সত্যি কথাই তো? এত মিষ্টি খেলে পেটে পোকা হয়।' কথাটা বলেই দূরে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিল লজেন্সটা। সবাই চুপচাপ হয়ে গেল। যূঁথীও গলাটা নামিয়ে বলে উঠল, 'ঠিক আছে। আর খাব না।' কথাটা বলে মাথা নামিয়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেছিল যূঁথী। অনেক শাস্তি খাবার থেকে বেঁচে গেছিল শুভঙ্কর। কিন্তু গালে বাবার থাপ্পড়ের দাগটা পরের দিনও ছিল। সারাদিনের মত ওর বাবা যখন অফিসে চলে গেল, তখন লুকিয়ে লুকিয়ে যূঁথী শুভঙ্করের কাছে এসেছিল। নিঃশব্দে ওর গালে হাত বুলাতে বুলাতে বলেছিল, 'শুভদা আমি sorry!'

সেই যুঁথী আজ কোথায় হারিয়ে গেছে জানা নেই। শুভঙ্করের বিয়ের সময়ও সে এসেছিল। শুভঙ্করের কাছ থেকে নিজের দাবি জানিয়ে বলেছিল, "শুভদা, তোমার বিয়েতে সাজতে হবে, পয়সা দাও।" শুভঙ্কর হাসিমুখেই ওর প্রস্তাব মেনে নিয়েছিল। তারপর একদিন চলে এল কলকাতা ছেড়ে বাইরে। যূঁথী রয়ে গেল কলকাতাতেই। একদিন খবর পেল যূঁথীর বিয়ে হয়ে গেছে। শুভঙ্কর যেতে পারেনি। সময় পেরিয়ে গেছে, দুজনেই যার যার সংসারে মিশে গেছে। আজ হঠাৎ মনে পড়ল সেই ছোটবেলাকার দিনগুলো - ভেসে উঠেছিল যূঁথীর সেই চনমনে মুখটা, একটা দীর্ঘশ্বাস কেঁপে কেঁপে বেরিয়ে এল। চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল শুভঙ্কর। এই তো জীবন।

দ্বিতীয় পর্ব

শুভঙ্করের কাছে আজ অফুরন্ত সময়। দৌড়ঝাঁপের পালা শেষ হয়ে গেছে অনেক দিন। সে একটা জীবন কাটিয়েছে শুভঙ্কর, তখন মন্ত্র ছিল 'চড়ৈই বেতী... চড়ৈই বেতী...'। আর আজ? মনটা অনেক শান্ত। রোজসকালে মর্ণিং ওয়াক থেকে ফিরে বাগানটার ধারে ওর ইজিচেয়ারটায় বসে। ওখানে বসে বসেই সকালের চা খায়-খবরের কাগজটা পড়ে। তারপর নিজের মনেই কিছুক্ষণ বসে থাকে। এই সময়টা একলা থাকতে খুব ভাল লাগে শুভঙ্করের। পুরোনো দিনের কত কথা মনে পড়ে যায়। সেই কলকাতার পুরোনো দিন। তখন গাড়ির চলার প্রদূষণ অত ছিল না। শুভঙ্কর দেখেছে মাগুনি কাকাকে রোজ সন্ধ্যে নামার আগে রাস্তার ধারে বসানো গ্যাসবাতি জ্বালাতে। তারও আগে গরমের দিনে যখন সদ্য বাধানো পীচের রাস্তাটা গরম হয়ে যেত, ভিস্তিওয়ালা জল ভরে রাস্তা ভিজিয়ে দিত। ওই সময়টায় দলবেঁধে শুভঙ্কর স্কুল থেকে ফিরত, তারপরই বাড়িতে একটু টিফিন খেয়ে বেরিয়ে যেত খেলতে। বাড়ির নিয়ম ছিল, মাগুনি কাকার গ্যাসবাতি জ্বললেই বাড়িতে ফিরে আসতে হবে।

খুব খুনসুটে ছিল শুভঙ্কর ছোটবেলায়। স্কুলেতেও খুব দুষ্টুমি করত আর complain আসত ওর বাবার কাছে। ওদের স্কুলের সামনেই একটা মাঠ ছিল। সেখানে দল বানিয়ে ফুটবল খেলা হত স্কুল শুরু হবার আগে আবার টিফিন পিরিওডে। সকাল দশটায় স্কুল শুরু হত, শেষ হত বিকেল চারটের সময়। পঁয়তাল্লিশ মিনিট করে সাতটে পিরিয়ড হত। মাঝখানে এক ঘন্টার জন্য ছিল মধ্যাহ্নভোজনের বিরতি। বাড়ির থেকে হাঁটাপথেই স্কুলে যাওয়া যেত। খুব মজা লাগত যখন পাড়ার সব ছেলেরা দলবল মিলে স্কুলে যেত। স্কুলের কিছু কিছু ঘটনা শুভঙ্করের মনে আসে। পকেটে করে লুকিয়ে ছোট বল নিয়ে যেত স্কুলে। পিটুখেলবে বলে। সেই সময় এই খেলাটা খুব জমিয়ে হতো। শুভঙ্কর তখন ক্লাস সিক্স-এ পড়ে। ওদের প্রথম ক্লাসটা নিতেন হরকুমারবাবু। তিনি বাংলা পড়াতেন। ক্লাসে ঢুকে প্রথমে roll call করতেন। তারপর একটি করে ছেলে বেছে নিতেন। আগের দিনের পড়া ধরার জন্য। ওনার একটা প্রিয় কবিতা ছিল। যখন কোনো ছাত্র তার সামনে হাজির হত, এক মিনিট তার দিকে দেখে, ঝট করে দুটো আঙুল দিয়ে তার পেটে চিমটি কেটে নিজের কাছে টেনে নিতেন আর ওই কবিতাটা আওড়াতেন, 'মৌমাছি... মৌমাছি.. কোথা যাও নাচি নাচি একবার দাঁড়াও না ভাই।' ব্যস কবিতাটা থেমে গেল, এবার জিজ্ঞাসা করার পালা। বলতো মুখস্থ বল। "দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার....' যদি সে বলতে পারল তো ঠিক, নয়তো তার পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিতেন, কি নিয়ে স্কুলে এসেছে... কেন পড়া মুখস্থ হয়নি..... যা কিছু থাকত পকেটে খেলার হোক্, খাবার হোক সব টেবিলের উপর রাখতেন ও বাজেয়াপ্ত করতেন। এটাও বলে দিতেন, পরের দিন পড়া না পারলে আরও কঠিন শাস্তি হবে। এইরকমই একদিন ডাক পড়ল শুভঙ্করের। সেদিন তার পকেটে ছোট বল ছিল। ওর মনে ভয় ছিল যদি বলটা বাজেয়াপ্ত হয় তবে তো আর খেলা হবে না। আর বাবার কাছেও নালিশ যাবে। রোজ একটু পিছন দিকেই বসত শুভঙ্কর। কারণ সামনে বসলে খুব সহজেই স্যরের নজরে পড়বে। পড়াশুনায় কখনই ভাল ছিল না শুভঙ্কর। সুতরাং সব সময়ই স্যরের নজর এড়াতে চাইত। কিন্তু সেদিন কেন জানি শুভঙ্কর হরকুমার বাবুর নজর এড়াতে পারেনি, রোল কল হবার আগে থেকেই কেন জানি তিনি বার বার করে তাকাচ্ছিলেন শুভঙ্করের দিকে। শুভঙ্কর বুঝতে পারছিল না কেন আজ তার প্রতি স্যরের নজর। তবে কি তিনি ওকে পিটু খেলতে দেখেছেন? যাইহোক ওর অবস্থা বুঝতে পেরে ওর পাশেই বসা একটি ছেলে ওকে আস্তে করে বলে উঠল, "দ্যাখ আজ বোধহয় হরকুমারবাবু তোকে ডাকবেন'। শুভঙ্করও বলে উঠল, 'আমারও মনে হচ্ছে তাই, কিন্তু বলটা লুকোবো কোথায়?' হঠাৎ পাশের ছেলেটি বলে উঠল, 'দাঁড়া মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে...' কথাটা বলেই পকেট থেকে একটা চুইংগাম বার করে কিছুটা ঝটপট চিবিয়ে শুভঙ্করের পেটের কাছে জামাটায় চিপকে দিল। শুভঙ্কর বাধা দিয়েও কিছু করতে পারেনি। রোলকল শেষ হলে যথারীতি ডাক পড়লশুভঙ্করের। মুখটা কাঁচুমাচু করে এগিয়ে গেল শুভঙ্কর, হরকুমার বাবু যথারীতি তাঁর প্রিয় গানটা শুরু করেই দুহাতে চিমটি কেটেই শুভঙ্করের জামাটা ধরতে যাবেন, ওনার হাতে জামায় আটকানো চুইংগামটা আঠার মত আটকে গেল। আঁৎকে উঠলেন হরকুমারবাবু, 'এ্যা... কি লাগিয়েছিস জামায়?' চিৎকার করে উঠলেন, শুভঙ্কর একটু হাঁকুফাঁকু করে বলে উঠল, 'কিছু না তো... কিছু না স্যর। 'কিছু না মানে?' কথাটা বলেই তিনি আবার ধরতে গেলেন চিমটি কেটে শুভঙ্করের জামা। আবার তাঁর হাতে আঠার মত আটকে গেল চুইঁগাম, ওনার হাত থেকে আর ছাড়ছেই না। ওনার নাক-মুখ বেঁকে যাচ্ছে হাতটা নিজের নাকের কাছ নিয়ে গিয়ে গন্ধ শোঁকার চেষ্টা করছেন। হরকুমারবাবুর হাবভাব দেখে হাসিও আসছিল শুভঙ্করের কিন্তু হাসলেই শাস্তির মাত্রা দ্বিগুণ হয়ে যেতে পারে। পকেটে বলটাও একটু উঠে আছে, নিজেকে কোনোরকম করে সংবরণ করে মুখটাকে কাঁচুমাচু করে রইল শুভঙ্কর। হরকুমার বাবু একটু মুখ বিকৃত করে বলে উঠলেন, 'যাঃ বোসগে যা। Lunch break-এ জামা বদলে আসবি। কীসব লাগিয়েছিস, নিজেরই খেয়াল নেই?' খুব বাঁচা বেঁচে

গেছিল সেদিন শুভঙ্কর, মুখটা চেপে কোনোরকমে নিজের সীটে ফিরে এসেছিল। তারপর বেঞ্চির নীচে মাথা নীচু করে খুব হেসেছিল। সেদিনকার কথা মনে করে আজও শুভঙ্করের মুখ দিয়ে অজান্তেই হাসি বেরিয়ে এল।

এই রকমই, আর একদিনকার কথা মনে পড়ে যায় শুভঙ্করের। সেটাও এক মজার ঘটনা ছিল। সাধারণত ওদের ক্লাসে শেষ পিরিয়ডটায় হতো ভুগোলের ক্লাস। অতুলানন্দ বাবু ক্লাসটা নিতেন। এক একটা chapter এক দিনেই শেষ করে দিতেন। সপ্তাহের পড়াটা উনি তিনদিনেই শেষ করে, বাকী দুদিন ক্লাসে বসে ঘুমোতেন। ছেলেদের একটা রচনা লিখতে দিতেন। রচনার বিষয়বস্তু 'গরু'ও হতে পারত আবার 'আমার দেখা কোনো শহর' কিংবা 'তোমার সব থেকে প্রিয় মানুষ' ইত্যাদি। যদি কারোর লেখা আগে শেষ হয় তবে তাকে স্যরের কাছে খাতা জমা দিতে হবে স্যর বললে সোট পড়ে শোনাতে হবে। স্যরের যদি পছন্দ হল তবে তার ছুটি হয়ে যাবে। দিনের শেষ পিরিয়ডটা করতে শুভঙ্করের ভাল লাগত না। ওর মন চলে যেত ক্লাসরুমটার বাইরে, জানলা দিয়ে দেখতো, কিছু ছেলে সামনের মাঠে বল নিয়ে খেলতে নেমে গেছে। কিন্তু যেদিন অতুলানন্দ বাবু ভূগোল পড়াতেন, সেদিন খুব মনযোগ দিয়ে শুনত শুভঙ্কর, দেশ-বিদেশের খবর শুনতে ওর খুব ভাল লাগত, কিন্তু যেদিন স্যর আগ্নেয় শিলা আর পাললিক শিলার প্রভেদ বোঝাতেন, সেদিন শুভঙ্করের ঘুম পেয়ে যেত। পাশের ছেলেটার সাথে বসে খাতায় কাটাকুটি বা বক্স খেলাটা খেলত। যেদিন স্যর রচনা লিখতে দিতেন সেদিন সেইভাবেই সময় কাটাত শুভঙ্কর। কিন্তু সেদিনটা ছিল একটু অন্যরকম। সামনের মাঠে ওরই জানাশোনা টিমের সাথে একটা ফুটবল ম্যাচ ছিল তিনটে থেকে। শুভঙ্করকে খেলবার জন্য ছেলেরা নীচের মাঠ থেকে ওর জানলার দিকে তাকিয়ে অনেক রকম ভঙ্গী করছিল, যাতে কোনো ছুতোয় বা 'পেটব্যথা করছে' বলে শুভঙ্কর ক্লাস থেকে বেরিয়ে আসতে পারে, শুভঙ্কর ক্লাসরুমের জানলা দিয়েই ইশারা করে ওদের বলছিল, একটু অপেক্ষা করতে। স্যর ক্লাসে এলে পেট ব্যথার অভিনয়টা করবে। ঠিক সময় অতুলানন্দবাবু এলেন, ক্লাসে ঢুকেই তিনি বলে উঠলেন, আজ তোদের একটা সোজা রচনা লিখতে দেব, দেখি কে কত আগে লিখতে পারিস, ঠিকমত লিখলেই ছুটি। 'স্যরের কথা শুনে শুভঙ্করও একটু উৎসাহী হল রচনার বিষয়টা জানার জন্য। কারণ যদি বিষয়টা সত্যি সোজা হয় তবে আর বাইরে যাবার জন্য অভিনয় করতে হবেনা, অতুলনানন্দবাবু এবার বলে উঠলেন, 'আজকের রচনার বিষয় হল 'তোমার দেখা একটি ফুটবল ম্যাচ'। সকলেই খুব মজা করে চেঁচিয়ে উঠল। ছেলেরা যে যার খাতা-পেন্সিল নিয়ে লেখা শুরু করে দিল, দু মিনিটের মধ্যেই অতুলানন্দ বাবুর চেয়ার থেকে নাক-ডাকার আওয়াজ শুরু হয়ে গেল। কী বিচিত্র সেই আওয়াজ। ধীরে থেকে শুরু করে আওয়াজটা ক্রমাগত দ্রুত হল এবং বেড়ে চলল। রেলগাড়ি নিজের লাইনে চলতে চলতে যখন লাইন বদল করে, তখন যে আওয়াজটা হয় , এই আওয়াজটা যেন তার সাথে মিলে যাচ্ছে। যাইহোক শুভঙ্করও খাতা পেন্সিল নিয়ে লেখা শুরু করল । খচ খচ্ করে কিছু লিখল তারপর চুপ করে বসে এদিক ওদিক দেখতে লাগল। দশ মিনিট বাদে শুভঙ্কর নিজের সীট থেকে দাঁড়িয়ে বলে উঠল, 'স্যার আমার লেখা শেষ হয়ে গেছে। একটু চমকে উঠলেন অতুলানন্দবাবু। তাঁর নাক ডাকাতে ব্যাহত হল, নিজেকে সামলে নিয়ে সোজা হয়ে বসলেন, তারপর বললেন, 'সেকি এত তাড়াতাড়ি তোর হয়ে গেল কী করে? ঠিকমত লিখেছিস তো? 'শুভঙ্কর একটা ঢোক গিলে বলে উঠল, 'হ্যাঁ স্যর!'

'ঠিক আছে নিয়ে আয়', বলে শুভঙ্করকে ডেকে নিল শুভঙ্কর ওর খাতাট নিয়ে ব্যস্তপদে এগিয়ে গেল, খাতাটা এগিয়ে দিল স্যরের কাছে। অতুলানন্দবাবু খাতার লেখাটা দেখলেন, আগের পৃষ্ঠা পরের পৃষ্ঠা ভাল করে দেখলেন। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে মন্তব্য করলেন, 'বাঃ এত চমৎকার রচনা তুই লিখতে শিখলি কবেথেকে? তুই তো স্কুলের নাম রাখবি ভবিষ্যতে?' ওনার কথা ঠিক বুঝতে পারে না শুভঙ্কর। তবে ওর লেখার প্রশংসা নিয়ে মনটায় এক প্রসন্নতা এল। গদগদভাবে শুভঙ্কর স্যরের দিকে তাকিয়ে রইল। ওর লেখা দেখে অতুলানন্দ বাবুর ঘুম সত্যিই সেদিন ছুটে গেছিল। তিনি সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলেন, 'শোন সকলে শোন শুভঙ্কর কি লিখেছে?' সকলেরই কলম আটকে গেল। সবাই অতুলানন্দবাবুর দিকে তাকিয়ে, অতুলানন্দবাবু শুভঙ্করের লেখাটা পড়তে শুরু করলেন। 'আমার দেখা একটি ফুটবল ম্যাচ।' 'দুদিন আগে আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে লেক গ্রাউন্ডে দেখতে গিয়েছিলাম একটা ম্যাচ। আকাশটা মেঘে ভরা ছিল, ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ছিল। তার মধ্যেই আমরা গেছিলাম ম্যাচটা দেখতে। ম্যাচ শুরু হতে না হতেই হঠাৎ ভীষণভাবে বিদ্যুৎ চমকে উঠল মেঘ ডেকে উঠল, তারপরেই শুরু হল মুষলধারে বৃষ্টি, বজ্র-বিদ্যুতের সাথে বৃষ্টি। রেফারি খেলা থামিয়ে দিল। আমরাও পুরো ভিজে গেছিলাম। রেফারি খেলা বন্ধ করে দিল। ভেজা কাপড়ে আমরা বাড়ি ফিরে এলাম।' অতুলানন্দবাবুর পড়া বন্ধ হয়ে গেল। সমস্ত ক্লাস নিস্তব্ধ হয়ে গেল। ওরা হাসবে না কি করবে বুঝে উঠতে পারল না। এমন সময় গর্জ্জে উঠলেন অতুলানন্দ স্যার, খাতাটা শুভঙ্করের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলে উঠলেন, 'তোর আজ ছুটি নেই। নিজের জায়গায় গিয়ে বসে থাক। স্কুলের ছুটি হয়ে গেলেও তোর আজ detention. যতক্ষণ না ঠিকমত রচনাটা লিখে আমায় দেখাবি ততক্ষণ তুই স্কুলে থাকবি। আমিও থাকব। ওনার কথার পর শুভঙ্কর আর কিছু বলতে পারেনি। চুপচাপ নিজের সীটে ফিরে গেছিল। কিছুক্ষণ মাথা নীচু করে বসেছিল। ছুটির ঘন্টা পড়ে গেল, সবাই যে যার ঘরে যাবার জন্য বেরিয়ে গেল। শুভঙ্কর একবার চোখ উঠিয়ে দেখল ওর ছোট ভাই দীপু ওদের ক্লাসের দরজার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। অতুলানন্দ স্যর নিজের সীটে বসে আছেন। শুভঙ্কর আস্তে আস্তে নিজের খাতা পেন্সিল বার করে লিখতে শুরু করল, প্রায় আধঘন্টা পর ওর লেখা শেষ হল, তখনও অতুলানন্দ স্যর সীটে বসে, কিছু কাগজ পড়ছিলেন। শুভঙ্কর ওনার কাছে গিয়ে নিজের খাতাটা এগিয়ে দিল। অতুলানন্দ স্যর চোখের চশমাটা নামিয়ে একবার শুভঙ্করের দিকে তাকালেন তারপর ওর খাতাটা নিয়ে পড়তে শুরু করলেন, পড়া শেষ করে ওর খাতাতেই কিছু লিখে দিলেন । ওর খাতাটা ফেরৎ দিয়ে বললেন, 'এবার কিছুটা হয়েছে । শুভঙ্করের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল 'আর কখনো এমন হবে না স্যর'। একটু মিষ্টি হেসে অতুলানন্দ বলেছিলেন, 'চালাকীর দ্বারা কোনো মহৎ কাজ হয় না, এটা মনে রাখবি।' তারপর একটু থেমে আবার বলেছিলেন, 'আমি তোর খাতায় লিখে দিয়েছি যে আমিই তোকে আজ detain করেছি। বাড়িতে যদি জিজ্ঞাসা করে ফিরতে কেন দেরী হল তবে আমার লেখাটা দেখিয়ে দিবি আর দেখিয়েছিস কিনা জানাবার জন্য, তোর বাবা কিংবা মায়ের সই করিয়ে আনবি এই লেখার নীচে।'

এরপরই সেদিন স্কুল থেকে ছুটি পেয়েছিল শুভঙ্কর, মাঠের খেলা তখন শেষ হয়ে গেছে। ছেলেরা সবাই যে যার বাড়ি ফিরে গেছে, ক্লান্ত পায়ে ছোট ভাই দীপুকে নিয়ে বাড়ি ফিরে এসেছিল। আজও সেদিনকার কথাটা মনে হলে হাসবে না কাঁদবে বুঝে উঠতে পারে না শুভঙ্কর। ছেলেবেলাকার সেই দিনগুলোর সাথে অতুলানন্দবাবু বা হরকুমারবাবুর মুখটাও ভেসে ওঠে চোখের সামনে।

অনেকদিন বাদে একবার কলকাতার রাজপথে হরকুমারবাবুর সাথে দেখা হয়েছিল। উনি তখন বয়সের ভারে অনেক ন্যুব্জ হয়ে গেছিলেন। চোখের চশমাটাও ঘসে গেছিল। শুভঙ্কর দাঁড়িয়ে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছিল। হরকুমার বাবু চিনতে পারেননি। না চিনবারই কথা। কত ছাত্রকে তিনি পড়িয়েছেন। কে তার হিসাব রাখে, কার সময় আছে ফিরে তাকাবার, শুভঙ্কর এক মিনিট থেমে নিজের পরিচয় দিয়েছিল, 'স্যর, আমার আজও মনে আছে আপনার সেই বিখ্যাত কবিতার লাইন, 'মৌমাছি মৌমাছি কোথা যাও নাচি নাচি... একবার দাঁড়াও না ভাই।'

আমি আপনার ছাত্র ছিলাম স্যর ১৯৫০ সালে। হরকুমারবাবু যেন চমকে উঠলেন, সে কী.... আজতো পঞ্চাশ ষাট বছর পেরিয়ে গেছে? শুভঙ্কর মৃদু হেসে বলেছিল, 'হ্যাঁ স্যর...' কিন্তু হরকুমারবাবু তখনও শুভঙ্করের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলেন, শুভঙ্কর ওই ঘষা কাঁচের মধ্যে দিয়েও দেখতে পাচ্ছিল, ওনার দুচোখ বেয়ে জল নেমে আসছে। ওনার হাতটা নিজের মাথায় রেখে বলে উঠেছিল, 'আপনি কাঁদছেন কেন স্যর?' একটু থতমত খেয়ে গিয়েছিলেন হরকুমারবাবু। নিজেকে সামলে নিয়ে বলে উঠেছিলেন, 'খুব আনন্দ হচ্ছে রে এই ভেবে যে আজও তোদের মত আমার কিছু ছাত্র আছে যারা, যতবড়ই হোক না কেন আমাদের মত শিক্ষকদের সম্মান দিতে জানে।' ওনার কথা শুনে শুভঙ্করের গলাও ধরে গেছিল। বোধহয় ওর চোখের কোণটাও ভিজে উঠেছিল। ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বর বেরিয়ে এসেছিল 'আপনাদের কি ভুলতে পারি স্যার। আপনাদের সাথে তো আমার ছোটবেলাকার দিনগুলো বাঁধা রয়েছে..'

হরকুমার বাবু দুহাত শুভঙ্করের মাথায় ঠেকিয়ে শুধু আশীর্বাদ করেছিলেন, 'ভাল থাক.... সুস্থ থাক...' তারপর পাশ কাটিয়ে ধীরে ধীরে তাঁর নাতির হাত ধরে সামনে এগিয়ে গিয়েছিলেন, শুভঙ্কর স্তম্ভিত হয়ে সেইভাবে ওখানে কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। তারপর এক সময় সামনের দিকে এগিয়ে গেল। মনের ভিতর থেকে কেঁপে কেঁপে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল । এই তো জীবন! আজও ছোটবেলাকার সেই দিনগুলো যখন মনের সামনে ভেসে ওঠে তখন মনে হয় সেদিনগুলো হারালো কোথায়?

চেনা সেই ব্যর্থ কোলাহল

বাঁধন সেনগুপ্ত

অনেকে মনে করেন, কাজী নজরুল ইসলাম-এর সৃষ্টির প্রাসঙ্গিকতা বা প্রয়োজন এখন আর তেমন নেই। অর্থাৎ এই সময়ের বিচারে এই কবি আর প্রাসঙ্গিক নন। তাঁর গানের বাণিজ্যিক সাফল্যও এখন নাকি তেমন কিছু নেই। এ কালের মানুষ তাঁর উত্তাপ ও প্রয়োজনও তাই অনুভব করেন না। সভা-সমিতিতে অনেকে প্রকাশ্যে তা স্বীকার না করলেও কেউ কেউ বলেন, কবির কীর্তি এখন কালের আঘাতে জীর্ণ। নজরুলকে অস্বীকার করা, অবদমিত করা অথবা খাটো করার এই জাতীয় প্রবণতা কম বেশি সকলেই লক্ষ্য করে আসছেন। এ হেন প্রয়াসও নতুন কিছু নয়।

কিন্তু এই ধারণা বা সিদ্ধান্ত যে কতখানি সঠিক তার বিচার করবেন কে? পেশাদার তুখোড় বক্তা আর চর্বিতচর্বণ প্রয়াসী কিছু নকলনবী অধ্যাপক - নাকি সেই প্রগতিবাদীর ধ্বজাধারী সঙেঘর গিরগিটি-সদৃশ উচ্চাকাঙ্খী রাজনৈতিক ফতোয়াধারী মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ? এ সংশয়ের অবকাশ কি সত্যিই বর্তমান?

একটু পেছনে ফিরে তাকানো যাক। সময়টা অক্টোবর ১৯৩৯। কবি-পত্নী প্রমীলার সেই প্রথম অসুস্থতার প্রত্যক্ষ প্রকাশ। ক্রমশ তাঁর নিম্নাঙ্গ অবশ হয়ে গেল। চলছে কবির তখন অসীম ব্যস্ততা। বেতারে বহুবিধ অনুষ্ঠান পরিচালনার কাজে তিনি মগ্ন। চল্লিশ বছর বয়সে পেশাগত সাফল্যের শীর্ষে তখন তাঁর অবস্থান। বিপুল রোজগারের পাশাপাশি সংসারের খরচও তখন উর্দ্ধমুখী। ফলে স্ত্রীর চিকিৎসার খরচও বাড়তে লাগল। বাধ্য হয়ে কবি বেচে দিলেন তাঁর সখের ক্রাইসলার গাড়ি। বেচে দিতে হল বালিগঞ্জে কেনা বাড়ি তৈরির জমিও। বাধ্য হয়ে নজরুলকে অনেক গানের প্রাপ্য রয়্যালটি সামান্য অর্থের বিনিময়ে লোভী ধুরন্ধর প্রকাশকদের কাছে পাকাপাকিভাবে বিক্রি করে দিতে হল। এরই মধ্যে তবু কবি রচনা করে চলেছেন আকাশবাণীর জন্যে বারোটি নতুন গানের সঙ্গীতালেখ্য 'দেবী দুর্গা'। বেতারে নিয়মিত পরিবেশন করছিলেন 'হারামণি', 'মেল-মিলন' ও 'পরবাস মালিকা'-র মত জনপ্রিয় অনুষ্ঠানগুলি। সময় পেলেই ছুটে যাচ্ছেন তারাশঙ্করের গ্রাম লাভপুরে। শীতের মধ্যরাতে সেখানে গলাজলে ডুব দিচ্ছেন প্রমীলার রোগমুক্তির প্রার্থনায়।

এল ১৯৪০ সাল। রবীন্দ্রনাথের ৮০তম জন্মদিনে গুরুদেবকে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানাতে ঐ অবস্থায়ও নজরুল কবিতা লিখে নিজে তা বেতারে পাঠের মাধ্যমে প্রচার করলেন। অর্থের চাহিদা মেটাতে অসংখ্য গানও লিখেছিলেন কবি তখন পাইওনিয়ার সেনোলা ও হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানীর জন্য। এমন কী সে বছর ঢাকা গিয়ে (১২ ডিসেম্বর) ঢাকা বেতার কেন্দ্রে কবি কলকাতার একাধিক শিল্পী সমন্বয়ে পরিবেশন করেছিলেন কবির নিজের লেখা গীতিবিচিত্রা - 'পূবালী'। তারপর এল ১৯৪১ সাল। ১৬ মার্চ কবি যোগ দিতে গেলেন বনগাঁ সাহিত্য সভার চতুর্থ বার্ষিক অনুষ্ঠানে সভাপতি হয়ে। সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। দিন কয়েক

পরেই বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির রজতজয়ন্তী উৎসবেও কবি উৎসব সভাপতি হিসেবে যোগ দেন। অথচ কবি নিজেও তখন অসুস্থ। কাউকে সে কথা তিনি জানাননি। কবির বয়স তখন মাত্র বেয়াল্লিশ। এই পর্বেই তিনি ফের 'দৈনিক নবযুগ' (নব পর্যায়) পত্রিকায় সম্পাদকীয় দায়িত্ব পালনে এগিয়ে গেলেন। সে বছরই মে মাসে প্রথম কলকাতায় মহাসমারোহে নজরুল জন্ম দিবস পালিত হল। সভাপতি কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী।

অকস্মাৎ এর পরই বাংলা সাহিত্যে ঘটল ইন্দ্রপতন। রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণ সংবাদ ৭ আগস্ট (১৯৪১) ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। স্বয়ং নজরুল তাঁর সাহিত্য গুরু অগ্রজ প্রয়াত ঋষি কবিকে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানালেন স্বরচিত 'রবিহারা' কবিতা স্বকণ্ঠে বেতারে আবৃত্তি করে। গান লিখে আকাশবাণীতে তা প্রচারও করলেন কবি নিজের গলায় ইলা ঘোষের সঙ্গে — "ঘুমাইতে দাও শ্রান্ত কবিরে, জাগায়ো না জাগায়ো না।" যুদ্ধের পটভূমি দ্রুত তখন ছড়িয়ে পড়ছিল। জাপান নেতৃত্বাধীন বাহিনীর যুদ্ধের সীমানা এশিয়ার ভূমিতে। আতঙ্কে উদ্বিগ্ন কলকাতার সঙ্গে সমগ্র দেশবাসী। সেই সঙ্গে চলছিল তীব্র সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম। ২৬ জানুয়ারি সুভাষচন্দ্রের অকস্মাৎ কলকাতা থেকে অন্তর্ধান ঘটল। গোপনে কাবুল হয়ে ইয়োরোপের পথে তিনি পা বাড়াতে চলেছেন। চারদিকে চলছিল ধরপাকড়। কিন্তু নজরুল শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও বিডন স্কোয়ারে আপ্লুত জনসভায় যোগ দিয়ে পালন করলেন 'সুভাষ দিবস'। তাঁর সম্পাদিত নবযুগ পত্রিকায় প্রকাশিত হল সেই আশ্চর্য রচনা - 'অগ্রপথিক' কবিতা। তখনও তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত হয় সতর্কবাণী —

অন্তরে যদি বিপ্লব নাহি আসে
বৈশাখী ঝড় আসে নাকো ভৈরব-প্রলয়োল্লাসে।
মৃত্যুশঙ্কা আসিলেই সব ডঙ্কা থামিয়া যায়
মুখের কথায় লঙ্কাকাণ্ড সকলে করিতে চায়।

সময়টা ১৯৪২ সাল নব পর্যায় 'দৈনিক নবযুগ'-এর ভার অসুস্থতা সত্ত্বেও নজরুল তখনও বহন করছিলেন। চলছিল আকাশবাণীতে পরিবেশিত অসাধারণ সেই রাগ রাগিনী ভিত্তিক 'হারামণি' পর্যায়ে গানের অনুষ্ঠান। সেইসঙ্গে 'চৌরঙ্গী' ছবির সঙ্গীত পরিচালনার কাজও। অথচ কবির অসুস্থতা তখন দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছিল। কিন্তু কবির হুঁশ নেই সেদিকে। ঘরে স্ত্রী প্রমীলা অসুস্থ। পঙ্গু অবস্থায় নিচু পায়ার তক্তাপোষে নিম্নাংশ কোনো রকমে ভর রেখে সংসারের শাক-সব্জী কাটাকুটি করায় ব্যস্ত থাকতেন তিনি। কবি বাড়ি এলে যথাসম্ভব পরিবেশনার নির্দেশ দিতেন তিনি। ঐ সংকট পর্বেও কবি 'নবযুগ'-এর সম্পাদকীয় কলমে লিখেছিলেন সেই ঐতিহাসিক শিরোনাম খচিত রচনা — 'পাকিস্তান বা ফাঁকিস্তান?' রচনাটি এখন কোথাও দেখা যায় না। বিভেদের বিরুদ্ধে কবির সতর্কবাণী হিসেবে রচনাটির ঐতিহাসিক গুরুত্বের কথা ভেবে এর পুনরুদ্ধার আশু প্রয়োজন।

ক্রমশ কবির অসুস্থতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। বেতারে চালু অনুষ্ঠানে যাতায়াত তাতেও বন্ধ হয়নি। জুলাই মাসের ৯ তারিখে আকাশবাণীতে এক সান্ধ্য অনুষ্ঠানে নজরুল কবিতা পাঠ করার সময় বারবার তাঁর কথা আটকে যেতে থাকে। গলা আড়ষ্ট হয়ে যায়। কবিকে বাধ্য হয়েই বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তেতাল্লিশ বছর বয়সে এসে প্রকাশ্যে সেই প্রথম তাঁর অসুস্থতা ধরা পড়ল। তারপর পাকাপাকিভাবে ঘটল তার গৃহে প্রত্যাবর্তন। এরপর তিনি সক্রিয় সৃষ্টির ভুবন থেকে দ্রুত অন্তরালে চলে যান। বেঁচেছিলেন এরপর আরও সুদীর্ঘ ৩৪টি বছর। কবির জীবনে সে এক নিষ্ঠুর অধ্যায়। হিসেবমত ভারত স্বাধীন হল কবির নির্বাক হবার মাত্র বছর পাঁচেক পরেই। নানাবিধ চিকিৎসার চেষ্টা, চিকিৎসা বিভ্রাটের পরে কেটে যায় আরও দশটি বছর। ১৯৪৬ সালে শ্বাশুড়ী গিরিবালা সেনগুপ্তার অকস্মাৎ একদিন অন্তর্ধান ঘটে যায়। ১৯৫৩ সালে কবিকে লণ্ডনে নিয়ে যাওয়া হল (১৫ ই মে)। ১০ ডিসেম্বর কবি যান ভিয়েনায়। পরে কবিকে নিয়ে যাওয়া হয় পূর্ব জার্মানীর বন-এ। সর্বপ্রকার চেষ্টা বিফল হওয়ায় নজরুল দেশে ফিরে আসেন সাত মাস পরে (১৪ ই ডিসেম্বর ১৯৫৩)। তারপর নির্বাক কবি কলকাতায় রইলেন টানা প্রায় কুড়ি বছর। তারপর স্বাধীন প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রীর আগ্রহে তিনি ঢাকায় যান এবং বছর খানেক বাদে অসুস্থ অবস্থাতেই ঢাকায় পি.জি. হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (২৯ আগস্ট ১৯৭৬)।

এতক্ষণ ধান ভানতে শিবের গীত বাধ্য হয়ে গাইতে হল। আসলে এই পটভূমির ইতিহাস পাঠকের সম্ভবত তেমন পরিচিত নয়। নজরুলের অবহেলার ইতিহাসের যে ধারাবাহিকতা, আসলে তার সূচনা কবি জীবনের সেই ঊষাকালে। তাঁর প্রতিভার অনুরক্ত মোহিতলাল বা সজনীকান্ত যেমন অনতিবিলম্বেই তাঁর বিরুদ্ধতায় কোমর বেঁধে নেমেছিলেন, তেমনি তাঁকে নোংরা কদর্য ভাষায় আক্রমণ করতে গোড়া থেকেই সক্রিয় হয়েছিলেন মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক হিন্দু ও মুসলিম পত্রপত্রিকার বৃহৎ এক অংশ ও একাধিক পত্র-পত্রিকা গোষ্ঠী। কবির হিন্দু রমণীকে বিবাহ নিয়েও কবির কুৎসায় মেতে উঠেছিলেন ব্রাহ্ম সমাজের একাংশ। একদিকে সেই নবীন প্রতিভার আগমনকে যেমন অনেকেই খোলা মনে গ্রহণ করতে পারেননি তেমনি মাত্র তেইশ বছরে প্রকাশিত প্রথম প্রবন্ধের বই 'যুগবাণী' (১৯২২) প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে এক মাসের মধ্যে ইংরেজ সরকার তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে (২৩ নভেম্বর, ১৯২২) শুধু তাই নয় নিষিদ্ধ ঘোষিত হয় কবির জনপ্রিয় কাব্যগ্রন্থ 'বিষের বাঁশী' (১৯২৪), বাঁধ ভাঙার গান (১৯২৪), প্রলয় শিখা (১৯৩০) সহ অন্যান্য কয়েকটি গ্রন্থ। এমন কী কাব্যগ্রন্থ ' প্রলয়ংকর' (১৯২৫) ও 'নমস্কার' (১৯২৫) ছাপার পর প্রেস থেকে তুলে নিয়ে যায় পুলিশ এবং বই ও পাণ্ডুলিপি সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ্যে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। ফলে সমকালীন অনেকেই তাতে খুশি হয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতেও পিছপা হননি। নজরুলের প্রতি অসূয়াবশত বিকৃত প্রতিকৃতি আঁকা থেকে শুরু করে নিন্দা ও আক্রমণে এবং তির্যক ব্যঙ্গোক্তিতে মুখর সজনীকান্ত বা শনিবারের চিঠির পাশাপাশি নজরুল বিরোধিতায় চূড়ান্ত নোংরামীতে মেতে উঠতে বিলম্ব করেনি সেদিনের 'প্রবাসী'র ঈর্ষামিশ্রিত সমালোচনা (প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪)। ব্যতিক্রম স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। কখনো ভুল বোঝাবুঝি সত্ত্বেও নজরুলের প্রতি তাঁর পক্ষপাত ও সমর্থন এবং আশীর্বাদ ছিল আজীবন একই ধারায় প্রবাহিত। 'বসন্ত' গীতিনাট্য উৎসর্গ করা, শান্তিনিকেতনে নজরুলকে আমন্ত্রণ, 'গোরা' ছবিতে নজরুলের সঙ্গীত পরিচালনার অনুমতি, অনশনকালে উদ্বিগ্ন গুরুদেবের ঐতিহাসিক টেলিগ্রাম তারই

অসংখ্য প্রমাণ। সাম্প্রদায়িকতার উর্দ্ধে থাকায় তিনি ছিলেন সেকালের 'সওগাত' (সম্পাঃ নাসিরুদ্দিন খান) পত্রিকার স্নেহধন্য। ফলে কবি 'সওগাত' প্রতিপক্ষ 'মোহাম্মদী' পত্রিকার বিষ নজরে পড়েন। এরা নিরন্তর বিশের দশক থেকেই নজরুলকে নানাভাবে আক্রমণ করে সর্বদা কুৎসার বন্যা বইয়েছিলেন। কবি তাই লাঞ্ছিত হয়েছেন আজীবন ছাপার কালিতে, চিঠিপত্রে, লাঠির প্রহারে ও অসংখ্য ফতোয়ার বিষক্রিয়ায়। এক বছরের কারাবাসের আগে ও পরেও বিভেদের কালিমা ভেদ করে তিনি এরই মধ্যে সৃষ্টির গভীরে নিমগ্ন থেকেছেন। ১৯২০ সাল থেকে ১৯৪২ একটানা এই আক্রমণের কখনো যেন বিরাম ঘটেনি। তিনি তবুও মাত্র দু দশকের মধ্যেই অসীম ধৈর্য্যের সাহায্যে রচনা করেছিলেন শতাধিক গ্রন্থ। তার মধ্যে ছিল তিনটি উপন্যাস, তিনটি গল্প সংকলন, একটি মক্তব সাহিত্য, তিনটি গানের স্বরলিপির বই এবং দশটিরও বেশি গানের সংকলনগ্রন্থ এবং চারটি নাট্যগ্রন্থ সংকলন সহ ছিল বেতারে পরিবেশিত প্রায় শাতধিক অনুষ্ঠানের জন্যে লেখা কথিকা, আলোচনা, গীতিনাট্য, সিনেমার স্ক্রিপ্ট ও কাহিনী। তাছাড়া ছিল চারটি সংবাদপত্র সম্পাদনা সহ পরিচালনার দায়িত্ব। তাই সুস্থাবস্থায় পেয়েছিলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাঙালির সম্মান। আজীবন পেয়েছিলেন কবি অপরিসীম জনপ্রিয়তা। হয়ে উঠেছিলেন জীবিতাবস্থায় বাংলার নয়নের মণি, অজস্র গানের বুলবুল এবং দারিদ্র্য, লাঞ্ছিত, অপমানিত, নিপীড়িত কোটি মানুষের নির্ভরতার আশ্রয়। প্রয়াণের পরেও এই উপ-মহাদেশে একমাত্র কবি হিসেবে তিনিই অসাম্প্রদায়িকতা ও মানবধর্মের শ্রেষ্ঠ প্রচারক হিসেবে আজও চিহ্নিত হয়ে আছেন।

রবীন্দ্রনাথের পর এখনও কাজী নজরুল ইসলামই প্রথম কবি যিনি সর্বত্র সুপরিচিত এবং যাঁর জন্মদিন বাঙালি মানস আজও শত অবেহলার অজ্ঞানতাকে অস্বীকার করেও শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করেন। তাঁর গানের রেকর্ড বিক্রি পড়তির দিকে বা তার গ্রন্থ আজকাল কেউ পড়েন না । যাঁরা সতত প্রচার করে পুলকিত হন তাঁদের অভিযোগ সত্যি কিনা তা প্রমাণ করবার দায় তাঁর অনুরাগীদের নয়। একদা চুরুলিয়ার নিঃস্ব, অসহায় আট বছরের দুখু মিঞাকে দুই বাংলার মানুষ সস্নেহে বরণ করে রেখেছেন তাঁদের হৃদয়ে তাঁর অসংখ্য গানের স্পর্শে ও অনুশীলনে। তাই প্রেম ও বিদ্রোহের যুগপৎ এই অগ্রপথিককে অস্বীকার করার ভাবনা আজও নিতান্তই বাতুলতা মাত্র। তাঁর সঙ্গীত ভারত ও বাংলাদেশের সেনাবাহিনীতে পাকাপাকিভাবে অমরসঙ্গীত হিসেবে স্থান পেয়েছে যার উদাহরণ পৃথিবীর কোথাও নেই। জানতে ইচ্ছে করে এ বিষয়ে সেইসব পণ্ডিতজনের অভিমত কী?

অদূর ভবিষ্যতের কাহিনী

সোমনাথ ব্যানার্জী

লবণ খেলে বাড়বে 'প্রেসার'
চিনি খেলেই 'সুগার'
পেট ভর্তি মিষ্টি পেলেও
ভাবতে হচ্ছে দুবার।
ধূমপান টা বাদ দিয়েছি
খাই না কো 'রেড মিট'
সকাল বিকাল হাঁটছি দুক্রোশ
রাখতে শরীর ফিট
ডিম খাওয়া প্রায় ছাড়াই আছে
পুঁইশাক আর ভেন্ডি
খেলেই আবার ইউরিক অ্যাসিড
পেরিয়ে যাবে গণ্ডি।
কিডনি টা ঠিক রাখার জন্য
খাচ্ছি প্রচুর জল।
সুরাপান টা হয় না এখন
পাচ্ছি ভালোই ফল।
কোমর ব্যথা, হাঁটুর ব্যথা
সমস্যা হর রোজ।
হোমিওপ্যাথি ওষুধ আছে
প্রতিদিন তিন ডোজ।
চুল গুলো সব পেকেই গেল
পেটের গণ্ডগোলে।
কলপ লাগাই গোঁফে, চুলে
থাকবো তরুণ দলে।
চোখেও এখন চশমা আমার
চশমা ছাড়া অন্ধ।
খবরের কাগজ যাওবা পড়ি
'ফেসবুক' তো বন্ধ

এসেছে শ্রাবণ

শিপ্রা সেন

চলে যায় বাদল সুদূর কোনো দেশে
চলে যায় বাদল আকাশে ভেসে ভেসে
ক্ষণে ক্ষণে আজ কেন বিজলি চমকায়
আকাশের বুক চিরে এঁকে বেঁকে যায়

মেঘের ঘনঘটা ভরে গগনে
বরষণ মুখরিত ভরা শ্রাবণে
চারিদিকে স্নিগ্ধ সবুজের মেলা
নবসাজে সাজে আজ সব তরুমালা।।

রিমঝিম রিমঝিম ঝরে বারিধারা
ডাকিছে দাদুর ওই হয়ে আত্মহারা
গ্রীষ্মের দাবদাবে মনপ্রাণ দগ্ধ
শ্রাবণের ঝরণায় হল যে তা স্নিগ্ধ

তিমির ঘন রজনী, সনসন বহিছে বাতাস
শিহরণ জাগায় প্রানে, মন আজ হয়েছে উদাস
নাচিছে ময়ূর তার পেখম তুলে
চারিদিক থৈ থৈ বর্ষার জলে।

কল্পনা

রিঙ্কি সেন

সে আমার গাঁয়ের বধূ
লাল ডুরে শাড়ী পরে
পিতলের কলসী কাঁখে
চলছে দিঘীর ঘাটে,
শ্যামবর্ণা চেহারাতে বধূর
এক ঢাল কালো কেশ
হরিণীর মত চোখ দুটি তার
দেখতে লাগে বেশ
শাঁখা-লাল পলা হাতে
সিঁথির সিঁদুর মাথে
আলতা রাঙা বধূর পায়ে
ঝুমকো নুপুর বাজে
লজ্জা ভরা চোখে বধূ
এদিক ওদিক দেখে
ঘরের লক্ষ্মী জল ভড়তে
চলছে দিঘীর ঘাটে ।

বাকরুদ্ধ

শর্বাণীরঞ্জন কুণ্ডু

যতদিন যাচ্ছে কি রকম মূক হয়ে যাচ্ছি।
যুক্তি, তর্ক ইত্যাদি থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছি।
সারাজীবন এত জোরজবর্দস্তি দেখে এসেছি,
সবই এখন বৃথা মনে হয়।
তবু মানুষ এসব করে।
কখনো না বুঝে,
কখনো ইচ্ছাকৃতভাবে।

বহু আগেই বুঝেছি
দেয় না কিছুই জোরজবর্দস্তি।

মানুষ নানারকম চিন্তা করে,
কল্পনা করে,
পরিকল্পনা করে।
সেসবের সম্মিলিত ফল
যে দিকে নিয়ে যায়
তা সবাইকেই চমকিত করে।

এইসব দেখেশুনে কি রকম মূক হয়ে যাচ্ছি।
তাই বলতে ইচ্ছে করে সতত এখন
এটাও ভাল, ওটাও ভাল,
ওরটাও ভাল, তা'রটাও ভাল,
কিন্তু সবার চাইতে ভাল,
ওই একজন যিনি আছেন সবার ঊর্ধে
তা'রই ওপর সব ভালমন্দ ছেড়ে রেখে
মূক হয়ে থাকা!

শ্রাবণী ঊষা

সনৎ চক্রবর্তী

ভোরের বহা নদীর জলে, স্নানটি সেরে নিয়ে
বৃষ্টি ভেজা এলোচুলে এলে হাসিমুখে
ভোর হয়েছে বললে তুমি দেখল সবাই প্রকাশ
যদিও সবাই জেগেছিল, মনে রাতের আভাষ,
ভোর হয়েছে মিটিয়ে ফেল সকল প্রাণের কালি
সবাই মিলে সাজিয়ে ধরো, সবুজ প্রাণের ডালি,
বাজিয়ে বাঁশি, মিলিয়ে সুর, ধরো হাতে হাতে,
গাও হে সবাই নবীন গান, সকল হাটে বাটে।

পুজো ২০১৫

প্রদীপ রায়

ম্যাডাক্স এ ঢোকার মুখেই ছেলেটি তাকে চোখ মারল। সম্পূর্ণ থতমত খেয়ে তাকাতেই ছেলেটি আবার চোখ মারল। সাথে সাথে মুখটাও যেন একুট বেঁকাল।

কি করা উচিত ভাবতে ভাবতে সাহায্যের জন্য এদিক ওদিক তাকাতে লাগল সে। তেমন সমব্যাথী কাউকে চোখে পড়ল না। বরং সকলেই দেখলাম চোখ মারতে ব্যস্ত। এ ওকে, সে তাকে, ছেলেরা মেয়েদের, মেয়েরা ছেলেদের, ছেলেরা ছেলেদের, মেয়েরা মেয়েদের চোখের ঈশারায় ব্যস্ত। চারিদিকে যেন চোখ মারার প্রতিযোগিতা চলছে। ব্যাপারটা তার কাছে এরোটিক লাগে। কিন্তু কারুরই কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। কোন চ্যানেলের বা এফ এমের প্রোগ্রাম মনে করে সে এদিক ওদিক তাকায়, কিন্তু তেমন কিছুই চোখে পড়ে না। অর্থাৎ এটা স্বাভাবিক শারদীয়া ঘটনা হিসেবে ঘটছে।

ঘুরে ছেলেটির দিকে তাকাতে দেখলাম সে তার দিকেই এগিয়ে আসছে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হওয়ার সুযোগ পর্যন্ত না দিয়েও তাকে সম্বোধন করে বলল ঃ

'নমস্কার। আপনাকে যে দুইটি নয়নবান নিক্ষেপ করলাম তাহা কি আপনার গোচর হয় নাই? জানি আমার অক্ষিযুগল কিঞ্চিত ক্ষুদ্র। কিন্তু উহার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দ্বিতীয়বার সামান্য মুখবিকৃতও তো করিলাম।'

ভয়ে তার সমস্ত শরীর অবশ হয়ে আসে। আজপঞ্চমী। এখন সন্ধ্যে ছটা। চারপাশে থিকথিকে ভীড়। কাছের রিচি রোড-পালিত স্ট্রীট-ক্যুপার স্ট্রীট-ল্যান্সডাউন-ইত্যাদি তার কিশোরবেলার চারণভূমি। আজই তার আগামী চারদিনের বয়ফ্রেন্ড এবং প্রোগ্রাম সেট করার শেষ সুযোগ। সেই জন্যই অষ্টমীর জন্য তুলে রাখা ড্রেসটা আজই ভেঙ্গে ফেলে, পার্লারে দুঘন্টা কাটিয়ে, সামান্য বিউটি স্লিপ দিয়ে এখানে এসেছে।

গত পরশু তার এক বন্ধু তার বয়ফ্রেন্ডের এক বন্ধুর সাথে আলাপ করিয়ে দিয়েছে, পরোক্ষে ছেলেটি জানিয়েছে ও পুজোয় এখনও খালি আছে। এবং তখনই পঞ্চমীর সন্ধ্যে, ম্যাডাক্স ইত্যাদি। সে প্রাণপনে চারধারে সেই ছেলেটিকে খুঁজতে লাগল।

আপনি কি অভীর সন্ধান করছেন।'

চমকে উঠল সে। ঐ ছেলেটির নাম তো অভীই। কিন্তু সেটা এ জানলো কি করে!

'অযথা চিন্তা করবেন না। অভী আমার বন্ধু। ওই আমায় আপনার কথা বলিয়া এখানে পাঠাইয়াছে। সঙ্গে সামান্য দৈহিক বিবরণ। এই সম্বলকরে গত পনেরো মিনিট প্রবেশ পথের কাছে ঐ গাছটার নিচে প্রবল ঝুঁকি লইয়া দাঁড়াইয়া আছি। এ যাবৎ আপনাকেই প্রথম একা প্রবেশ করিয়া অসহায় ভাবে ইতিউতি অবলোকন করিতে দেখিলাম। লক্ষ্য বিঁধিয়াছে মনে হইল। তবু নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্য নয়নবান নিক্ষেপ করিলাম। বুঝিতেই পারিতেছেন আমার যাত্রা সফল।"

সে কেমন বোকার মত সামনের এই পিসটাকে দেখতে লাগল। দেখতে কিন্তু মন্দ নয়। পরনে ডেনিম ও মেরুন টী-শার্ট। স্বাস্থ্য ভাল। জিম চর্চা করে মনে হয়। হাল্কা ডিওর গন্ধপাচ্ছি কী! চুল ঘন। জেল লাগান কিনা বোঝা যাচ্ছে না। যথেষ্টই পাতে দেবার মতো। কিন্তু মুখের ভাষাটা এরূপ মানে এরম কেন?

'অভী আসবে না। ও এবারের পুজোটা অধরামাধুরীছন্দোবন্ধনের সম্ভিব্যহারে কাটাবে।'

সে যারপরনাই বিস্মিত হয়ে কেমন বমকে গেল। একী নাম না রেলগাড়ী। লজ্জার মাথা খেয়ে জিজ্ঞেস করে ফেলল 'এ কেমন নাম'?

ছেলেটির মুখে কোন প্রতিক্রিয়া নেই। অত্যন্ত কেজো ভঙ্গীতে সে বলে "ওর নাম অধরামাধুরীছন্দোবন্ধনে প্রাণচায়চক্ষুনাচায় দাস অধিকারী মহাপাত্র। মেয়ের নাম দেওয়ার জন্য ওর মাতা রবীন্দ্রসংগীতের এক একটা শব্দ ব্যবহার করতে মনস্থ করেন। দুটির পরেই ওর পিতা মাতার মুখ চেপে ধরেন. জনশ্রুতি এসময় বাচ্চাটও নাকী কেঁদে ওঠে। তাই ব্যাপারটা ওখানেই শেষ।'

'আর ঐ পদবী? দুটো শুনেছি। কিন্তু তিনটে?'

'সেটা ওর পিতার দূরদৃষ্টি। দাস অধিকারী তো বুঝতেই পারছেন। মহাপাত্র আসলে ভবিষ্যতলোপী সমাস। তার কন্যার স্বামীর পূর্ব বিবরণ।'!

মাথাটা কেমন যেন করছিল। চারপাশে নতুন জামার গন্ধ, খসখস, সুসজ্জিত মন্ডপ, চায়ের, রোলের দোকান। এই চরম বাস্তবের মধ্যে একী পরাবাস্তব।

ছেলেটি বলে "আপনি কি এইরূপ নামকরণের উপকারিতা কখনও ভাবিয়া দেখিয়াছেন? প্রথমতঃ এই নাম প্রসিদ্ধি লাভের প্রথম সোপান। এ ব্যতীত সম্বোধনের জন্য নামের বিন্যাস ও সমবায় অপরিমেয়। অধরা, প্রাণ, মাধুরী ইত্যাদি প্রভৃতি যাবতীয় সুবিধা, পছন্দ আপনার।"

সে অবাক বিস্ময়ে ছেলেটির দিকে তাকিয়ে ছিল। একী স্বপ্ন না সত্যি! সেই মুহূর্তে যেটা তার মনে হল সেটাই জিজ্ঞেস করল।" আচ্ছা আপনারও কি এরকম কোন নাম আছে?" "অবশ্যই আছে। আমার নাম নিবারণ চক্রবর্তী। আসল নাম। আমার পিতা মাতার ঠাকুরভক্তির নিদর্শন আমি বহন করে বেড়াচ্ছি। মাঝে মাঝে বিড়ম্বিত হই যখন কেউ ছদ্মনাম ভাবে। তবে কিছু সুবিধাও আছে। সচরাচর কেউ আমার নাম বিস্মরণ হয় না। সম্বোধনের জন্যও সুবিধাজনক। বন্ধুবান্ধবেরা আমায় নিম্বুরা বলে, বান্ধবীদের ঘনিষ্ঠতার উপর ডাক নির্ভরশীল। যাহাই হউক এখন আপনার সিদ্ধান্ত জানান।"

সে আবার কী? আমায় কি কোন প্রশ্ন করা হয়েছিল? মাথার ভেতর একে তো ভনভন করছে, তার ওপর একি হেঁয়ালী! আমার সিদ্ধান্ত মানে কি? ছেলেটি কিন্তু বুদ্ধিমান। কোনরকম ভনিতা না করেই সে বলল "আপনি কি এই পুজো অভীর জন্য প্রতীক্ষায় অতিবাহিত করবেন না আমায় একটা সুযোগ দেবেন? হাঁ হলে কিছু প্রাক শর্ত, কিছু অনিবার্যতা আছে। পরিশীলিত ও সংবেদী মনোপশ্চাদপট আপনার আছে বলে আমার প্রত্যয়। নিবারণ আপনাকে হতাশ করবে না। আর আমাদের জুটি হিসেবে ভালই মানবে। পুজোর পরেও। আর আমার সাহচর্যে আপনার ভাষার ব্যুৎপত্তিও কিঞ্চিত বাড়বে, ও কোনসময়ই আপনি বোর হবেন না।'

সে আকাশের দিকে তাকাল। 'বোর' সত্যিই বোধহয় হবে না!!!

বসন্ত এসে গেছে

তপন কুমার গঙ্গোপাধ্যায়

"আমরা সবাই রাজা, আমাদের এই রাজার রাজত্বে...." মনের এই উপলব্ধিটাই আসল। এটা মনে করতে পারলেই অনুভব করতে পারবেন বসন্ত এসে গেছে, কোকিলের কুহু কুহু রব এই বর্ষামুখর দিনেও কাতর করবে না। জীবনটাকে আমরা কিভাবে দেখি এবং বাস্তবিক পরিস্থিতির সাথে কিভাবে সমঝোতা করে চলি সেটাই বড় কথা, আর মূল্যায়নটাও সেই মাপদণ্ডেই বিচার করা হয়। এগুলো সকলেরই মনের কথা। বসে আছি পথ চেয়ে, তাই ভাবলাম মনের জোয়ারে যে দমকা হাওয়া এসে ধাক্কা দিচ্ছে - সেটাই প্রকাশ করতে পারলে তবেই তো ভাবনার বিনিময় হবে।

দেবতাদের মধ্যে বিরাট দ্বন্দ্ব, কে বড়। ওদিকে শুক-সারীরা প্রতিযোগিতায় নেমেছে এই রহস্যের সমাধানে। প্রায় সব বাড়িতেই অলিখিত একটা নিয়ম চলে আসছিল, কর্মক্ষেত্রে স্বামী ছড়ি ঘোরাচ্ছে, কিন্তু স্ত্রী গৃহস্থের ব্যাপারে ওনাকে এগুতে দেন না, খুউব বিপাকে না পড়লে। আজকাল কিন্তু স্বামী স্ত্রী দুজনেই সকালে ব্যাগ, জলের বোতল, টিফিন (যদি পাকাপোক্ত কাজের লোক থাকে) নিয়ে বেরোন। ব্যবধান বিশেষ নেই - শুধু চিন্তাধারা পাল্টেছে - 'পার্টনার', ওইসব দখলদারির ব্যাপার নেই, নিজে আনো, নিজে খাও, সময় থাকলে করে দাও, এলিয়ে পড়ো না। বাচ্চা মানুষ করা - তার জন্য সময় দিতে হবে, অর্থ ঢালতে হবে প্রতিপদে, নার্সারীর ভর্তি থেকে শুরু করে - যত বড় হবে তত গুণ বাড়বে। এবার চটজলদি হাসিলের জন্য নাচ-গান, আঁকা, ক্যারাটে, ক্যাসিও মোটামুটি হাতের কাছে যা পাওয়া যায় সব ক্লাসে ভর্তি কর - দিয়ে এস, নিয়ে যাও। ভেবে দেখলে কম বয়সেই মাথা ঘোরাতে থাকে। এখন আবার বিদেশ সফরের সময় বাঁধা হয়ে না দাঁড়ায় তাই রেজেস্ট্রিটা করে বিয়েটা সেড়ে নেওয়া - আগের মত জীবন শুধু সেলুলয়েডে আবদ্ধ রাখা চলে না। এত শত ভাবার পর মূল সিদ্ধান্ত হল খাও, দাও আর জীবনের জয়গান গেয়ে যাও।

সবাই কিন্তু এই ভেবে পিছিয়ে পড়ে না, বিশেষ করে গুণী মেয়েরা। এবারে দেখলাম সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (২০১৫) প্রথম দশজনের মধ্যে পাঁচজনই মেয়ে - আর প্রথম জন শারীরিকভাবে কিছুটা অক্ষম হলেও ওনার মানসিক জোর অতুলনীয় - তাই আজ ও শীর্ষে।

এরা কী ঘর করবে না, নিশ্চয়ই করবে ও খুব ভাল ভাবে এগিয়ে যাবে, সংসারের এই জটিল তাল-মিল সমাধান করবে দাবার গুটির দানের মত অনেক ভেবে-চিন্তে চাল দিয়ে।

মনের আয়নায় এসে ভিড় জমাল বেশ কয়েকটা সাহসী বুদ্ধিদীপ্ত, লড়ব, খেলব, জিতবরে মহিলার মুখ। প্রতিষ্ঠিত বিদেশী কোম্পানীতে যারা উচ্চপদে আসীন এবং অনেকেরই ঈর্ষার পাত্র । অর্থের অঙ্ক শুনলে চোখ বড় বড় হবেই, কিন্তু সাংসারিক ব্যাপারে এঁরা উদাসীন নয়, উন্মাসিকতার কোনও ছাপ বা নিজেকে বড় দেখানোর কোনও প্রয়াস নেই। স্বক্ষেত্রে নিজেরা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এরা জীবন সঙ্গীকে বেছে নিয়েছেন অন্য পেশা থেকে যে অর্থের বলে অতটা বলীয়ান না হলেও, মানুষটা ভাল - হুশ আছে। একজন লন্ডন, প্যারিস, নিউইয়র্ক কর্মসূত্রে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তো অপরজন শিল্পী মন নিয়ে মেতে আছে। ঘরে কি সুন্দর বাতাবরণ তৈরি হয়েছে, একজন অপরকে মেনে নিতে পারায়। চির প্রচলিত প্রথার বৈপরীত্য থাকায়, প্রথমে পুরুষমনে একটা সংঘাতের ঝড় বয়ে যায়, কিন্তু এরকম তো কোনও অলিখিত নিয়ম নেই যে মেয়েরাই কচিকাঁচাদের সামলাবে, পড়াশুনো দেখবে, সাথে গৃহস্থালী সামলাবে। আজ পুরুষরাও যদি এই কাজটার মুখ্য ভাগটার অংশীদার হয়ে এগিয়ে যায় তাহলে বাঁধনটা হয় অনেক মজবুত। মুখ্যস্রোত থেকে বেরিয়ে এসে এই ছন্দটাকে বজায় রাখার জন্য মহিলাদের নিজেদের পছন্দ অপছন্দ অনেক কিছুর সঙ্গে আপোষ করে নিতে হয়, ভাল কিছু পেতে হলে এই ত্যাগ স্বীকারকে খুশি মনে মেনে নেওয়াতেই সার্থকতা। আমি জ্ঞানে সর্বজ্ঞ (I factor), এই চিন্তাধারা মুক্ত হয়ে এগিয়ে গেলে, ফুলের ঘ্রাণ ও সৌরভের মুখোমুখি হওয়ার সাথে মন বলবেই, 'বসন্ত এসে গেছে', আনন্দধারা বহিছে ভুবনে।

নয়ডা কালীবাড়ি প্রাঙ্গণে রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসবের কিছু মুহূর্ত

শোক সংবাদ

গত ২রা এপ্রিল আমাদের সঙ্ঘের সদস্য শ্রী আশিষ ভট্টাচার্য্যর পিতা শ্রী অরবিন্দ ভট্টাচার্য্য পরলোক গমন করেন।

গত ৪ঠা মে আমাদের সঙ্ঘের সদস্য শ্রী সুপ্রভাত করের মাতা শ্রীযুক্তা স্মৃতিরাণি কর পরলোক গমন করেন।

গত ২৪শে জুন আমাদের সঙ্ঘের সদস্য শ্রী ডি. দত্তর ভ্রাতা শ্রী কল্যাণ দত্ত পরলোক গমন করেন।

আমার সঙ্ঘের তরফ থেকে সকল প্রয়াত আত্মার শান্তি কামনা করি এবং সকল শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই।

পাত্রী চাই

পাত্র ঃ শ্রী সুদীপ্ত চ্যাটার্জ্জী।
বয়স ৩০ বছর, B. Com (Hons.)
দেবারি গণ ঃ কাশ্যপ গোত্র
গুরগাঁওতে MNC কোম্পানীতে কর্মরত as Director (Operation)
মাতা ঃ অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষয়িত্রী
যোগাযোগ ঃ Mrs. Bandana Chatterjee, D-714, Ram Vihar (Appt.) Sector-30, Noida
Mob. : 9999415136

ব্রাহ্মণ, ফর্সা, ৬ ফুট ১ ইঞ্চি, ২৮ বৎসর, দেবারিগণ, B. Tech. (IT-Gold Medalist), Software Engineer, বর্তমানে Accenture Punaতে কর্মরত, বার্ষিক আয় ৯ লাখের উর্ধে পাত্রের জন্য - ফর্সা, সুন্দরী, ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি থেকে ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি পর্যন্ত, ২৫ থেকে ২৮ বৎসর বয়স অবধি professional পাত্রী চাই। বাবা Retired RBI অফিসার এবং নাগপুরে নিজস্ব বাড়ি। নরগণ পাত্রী ক্ষমা করিবেন। যোগাযোগ করুন ঃ Samir Chatterjee, 79 Sundarban Layout, Narendra Nagar, Nagpur-15, Ph. : 09923810086 (M), (0712) 2783968 (Landline)

পাত্রী চাই

পাত্র ঃ অঞ্জন কুমার মুখার্জী
বয়স ঃ 38 বছর, বি.কম পাশ
নয়ডায় কর্মরত as senior Data Reseacher
পিতা - স্বর্গত। মাতা - Retired Lab Technician Medical College (A.M.U.)
নিবাস ঃ 255, Aras Vikas Colony, G.T. Road, Aligarh, U.P.
সুযোগ্যা কর্মরত বাঙালি পাত্রী চাই।
(Preferably in NCR)
যোগাযোগ নম্বর ঃ 8439239050
e-mail : shiprabanerjee.44@gmail.com

পাত্র চাই

পাত্রী ঃ বাসব ঘোষ
বয়স ঃ 28 বছর
উচ্চতা ঃ 5'5"। ওজন ঃ 63 কেজি
কর্মস্থান ঃ Working KPMG as Auditor
শিক্ষা ঃ BBS (Shaheed Sukhdev Singh) CA, Qualified Zoll
পিতা - স্বর্গত। নিবাস ঃ C-492, Sector-19, Noida
যোগাযোগ নম্বর ঃ 9811049461

পাত্র চাই

বৈশ্য সাহা, অসবর্ণ সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। পাত্রী বয়স ৩২, দিল্লী নিবাসী। B.A., MBA. কর্মরতা - ফর্সা সুন্দরী।
যোগাযোগ নম্বর ঃ ৯৫৬০৫৭৩৩২২

সাহিত্য চর্চায় আগ্রহী বন্ধুরা নীচের ঠিকানায় লেখাপাঠান :

সম্পাদক
সমন্বয়
নয়ডা বেঙ্গলী কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন
ইঃ সি, কালীবাড়ী মার্গ, সেক্টর ২৬
নয়ডা ২০১৩০১
ফোন ০১২০- ২৫২২৮৩৬ / ৪৫৪৭৩৭৫

Published by Amiya Das, Secretary,Noida Bengali Cultural Association and printed by Delhi Paper Products.